প্রকাশক :
প্রকাশচন্দ্র সাহা
গ্রন্থম্
২২।১ বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

একমাত্র পরিবেশক :
পত্রিকা সিণ্ডিকেট (প্রাঃ) লিমিটেড
১২/১ লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭

প্রথম প্রকাশ :
রবীন্দ্র পক্ষ, ১৩৬৩

প্রচ্ছদ :
প্রণব শূর

ব্লক :
প্রসেস ইণ্ডিয়া
কলিকাতা—১৪

মুদ্রাকর :
চিত্তরঞ্জন সরকার
জি. বি. প্রিণ্টার্স
৫ বি, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড
কলিকাতা—১৪

একাঙ্কগুচ্ছ

নাট্যকল্লোল

উৎপল দত্ত

অপরাজিতেষু

মন্মথ রায়

একাঙ্কগুচ্ছ

॥ সূচীপত্র ॥

এক টিন বার্নিশ । এক

একটি রাজকীয় মৃত্যু । দশ

মুখোশ । চব্বিশ

সত্যমেব জয়তে । একত্রিশ

বীক্ষণ । পঁয়ত্রিশ

দাওয়াই । চল্লিশ

এই হয়েছে আইন । চুয়াল্লিশ

কষ্টিপাথর । আটচল্লিশ

অলৌকিক । আটান্ন

এক টিন বার্নিশ

[একটি পার্ক। সবে সূর্য অস্ত গেল। পার্কের জনবিরল অংশে কুঞ্জবীথির অন্তরালে বসিবার জন্য দুইটি বেঞ্চ। একটি বেঞ্চ খালি রহিয়াছে। অদূরে অপর বেঞ্চটির ধারে দুইজন পুরুষ আসিয়া দাঁড়াইল। এই পুরুষ দুইটির চেহারা এবং পোষাক দুই-ই অস্বাভাবিক, এবং অদ্ভুত। বলিয়া দেওয়াই ভাল, ইহারা শয়তানের অনুচর।]

১ম অনুচর ॥ এ অঞ্চলে শয়তানের অনুচর তুমি ?

২য় অনুচর ॥ মনে হচ্ছে শয়তানের সদর দপ্তরের লোক আপনি !

১ম অনুচর ॥ তোমার অনুমান মিথ্যা নয়।

[প্রথম অনুচর একটি সোনালী পাঞ্জা দেখাইল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় অনুচর প্রথম অনুচরের সামনে নতজানু হইয়া নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।]

২য় অনুচর ॥ এ অঞ্চলে শয়তানের দাসানুদাস আমিই হুজুর। এইবার আজ্ঞা করুন।

১ম অনুচর ॥ সেই সাংঘাতিক চুরির কোনও কিনারা হল না আজও।

২য় অনুচর ॥ কোন্ চুরিটা হুজুর ?

১ম অনুচর ॥ কোনও খেয়ালই নেই দেখছি তোমাদের। যে চুরিটার জন্য শয়তানের চোখে ঘুম নেই, যে চুরির কথা বছর বছর বার্ষিক সভায় জানিয়ে দেওয়া হয় তোমাদের, মারাত্মক সে চুরিটার কথা বেমালুম ভুলে গেছ তুমি ? অপদার্থ !

২য় অনুচর ॥ আপনি কি বার্নিশের সেই টিনটার কথা বলছেন ?

১ম অনুচর ॥ হ্যাঁ, বার্নিশের সেই টিন। এমনভাবে কথাটা বললে যেন একটা খোলামকুচি। কিন্তু জান কি, শয়তানের সিন্দুক থেকে সেই বার্নিশের টিনটা চুরি যাবার পর থেকে আমাদের প্রভুর আহার গেছে, নিদ্রা গেছে, মনে নেই এতটুকু শান্তি—

২য় অনুচর ॥ ওটা যে এতবড় একটা ব্যাপার, খেয়াল হয় নি আমার। দয়া করে

একটু বুঝিয়ে বলবেন, জিনিসটা সত্যি সত্যি কি? ওর এতটা গুরুত্বই বা কেন? তবেই তদন্তটা সহজ হবে না কি?

১ম অনুচর ॥ বার্নিশ দেখ নি কোনও দিন? একটা তরল পদার্থ। তবে বেশ খানিকটা ঘন। কোন জিনিস বার্নিশ দিয়ে পালিশ করে দিলে তার সব গলদ ঢাকা পড়ে। একটা নতুন চাকচিক্যে জিনিসটা ঝকমক করে।

২য় অনুচর ॥ তা এ বার্নিশ তো আমরা হামেশাই দেখি। যে কোনও রঙের দোকানেই মেলে। দামও নয় এমন কিছু। এই বার্নিশের একটা টিন—তা শয়তানের সিন্দুকেই বা ওঠে কেন, আর তা চুরি হলে এত সোরগোলই বা কেন—এ কিন্তু আমার মাথায় ঢুকছে না হুজুর। দোকানে গিয়ে আর একটা টিন তুলে নিলেই হয় না কি?

১ম অনুচর ॥ শয়তানের চাকরি তুমি যে কি করে পেয়েছ, আমি বুঝছি না। কোনও সাধু-সন্ন্যাসীর চেলা হলেই তোমার ছিল ভাল।

[বাতাসে শয়তানের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল]

শয়তান ॥ ত্রিভুবনে শয়তানের অনুচর যে যেখানে আছ শোন।

২য় অনুচর ॥ বড় হুজুরের গলা!

১ম অনুচর ॥ হ্যাঁ। মন দিয়ে শোন।

২য় অনুচর ॥ কিন্তু সবাই শুনবে যে?

১ম অনুচর ॥ যারা শয়তান, শুনতে পায় শুধু তারা।

শয়তান ॥ শয়তানের সিন্দুক থেকে বার্নিশের টিন চুরি হয়েছে। বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে উদ্ধার হল না সে টিন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফেরত চাই আমি সেই টিন। যেখান থেকে হোক যেমন করে হোক। ওটা আমি ফেরত না পেলে তোমাদের কারও চাকরি থাকবে না। আমিই থাকব কিনা সন্দেহ।

১ম অনুচর ॥ শুনলে?

২য় অনুচর ॥ শুনলাম। কিন্তু এই শয়তানী বার্নিশ কে চুরি করবে, কেন চুরি করবে এখনও আমি বুঝে উঠতে পারছি না হুজুর।

১ম অনুচর ॥ কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে থাক, তবেই বুঝবে। সন্ধ্যেবেলায় এই পার্কে অনেক রকমের লোক আসে। কেমন?

২য় অনুচর ॥ হ্যাঁ, তা আসে। শয়তানী সলাপরামর্শের একটা বড় আড্ডাই এই পার্ক। এইটেই আমার সবচেয়ে বড় এলাকা হুজুর।

১ম অনুচর ॥ ওই যে কারা আসছে—

২য় অনুচর ॥ আসুন, আমরা সরে দাঁড়াই।

১ম অনুচর ॥ আঃ, কেন তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, লোকে আমাদের দেখতে পায় না—শুনতে পায় না আমাদের কথা।

২য় অনুচর ॥ ও হ্যাঁ, তাও তো বটে হুজুর।

১ম অনুচর ॥ আমাদের দেখা পায় ওরা মনের কোণে কিংবা স্বপ্নে। আমাদের কাজকর্ম সবকিছু মনে মনে। তোমার এসব দেখছি কিছুই খেয়াল নেই। তোমার কদ্দিনের চাকরি ?

২য় অনুচর ॥ আজ্ঞে হুজুর, এই বছর দুই।

১ম অনুচর ॥ আগের জন্মে তুমি কি ছিলে ?

২য় অনুচর ॥ আজ্ঞে, ইস্কুল-মাস্টার।

১ম অনুচর ॥ এ লাইনে এসেছ কোন্ গুণে ?

২য় অনুচর ॥ নিজে শিখেছিলাম, ছাত্রদেরও শেখাতাম সদা সত্য কথা বলিবে। চুরি করা মহাপাপ। কিন্তু দেখলাম আমার একটা ছাত্রও বড় হতে পারল না। সারাজীবন দুঃখকষ্টেই কাটাল। আমার তো কাটলই। তাই আমি শিক্ষাটা বদলে দিলাম। চুপিচুপি শেখাতে লাগলাম সদা মিথ্যাকথা বলিবে। চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা। আর এতে যা কাজ হল, সে যেন এক ম্যাজিক !

১ম অনুচর ॥ বুঝেছি, সেই পুণ্যেই পেয়েছ এই চাকরি। কিন্তু তোমার বোকা-বোকা ভাবটা রয়েই গেছে দেখছি। যাবে, ওটা পরের জন্মে যাবে। বাঃ, মেয়েটি তো বেশ !

২য় অনুচর ॥ কিন্তু হুজুর চরিত্রটা বেশ নয় !

১ম অনুচর ॥ খুব সাজসজ্জা দেখছি।

২য় অনুচর ॥ ওই তো ওর অস্ত্র। বয়সটাকে কেমন ঢেকে রেখেছে দেখুন। আর সেইসঙ্গে কথাবার্তায় পালিশটাও দেখছেন।

১ম অনুচর ॥ হ্যাঁ। বার্নিশের আর্টটা জানে মনে হচ্ছে।

[অতি-আধুনিক সাজসজ্জায় ভূষিতা একটি তরুণী এবং একজন লালসা-জর্জরিত ধোপ-দুরস্ত প্রৌঢ়ের প্রবেশ।]

তরুণী ॥ (অত্যন্ত ছলা-কলা সহযোগে) রিয়েলি !

প্রৌঢ় ॥ (রমণীরঞ্জন ভঙ্গীতে) হ্যাঁ।

তরুণী ॥ কি চমৎকার আজকের সন্ধ্যা। রবিঠাকুরের সেই কবিতাটা মনে পড়ছে।

প্রৌঢ় ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারও।

তরুণী ॥ কোন্ কবিতাটা বলুন তো!

প্রৌঢ় ॥ ওই যে সেইটা—ভদ্রলোক এত কবিতা লিখে গেছেন, বেছে নেওয়াও এক বিপদ!

তরুণী ॥ রিয়েল, ভাবতে অবাক লাগে। কবির ফটোটিতে রজনীগন্ধার একটি মালা দিয়ে অপলক চোখে চেয়ে থাকি আর ভাবি—তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি—

প্রৌঢ় ॥ ওয়াণ্ডারফুল। আমারও মনে পড়েছে—'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি—' এই যাঃ! তারপর ভুলে গেছি!

তরুণী ॥ থাক্, ওতেই হবে। তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।

প্রৌঢ় ॥ বিয়েলি! ওয়াণ্ডারফুল। তবে ওঠ—চল।

তরুণী ॥ এই, জান, বাচ্চাটার বড্ড অসুখ। কাল সকালে বড় ডাক্তার না আনলেই নয়। অন্তত পঞ্চাশটি টাকা আজই আমার চাই।

প্রৌঢ় ॥ (তরুণীর হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া) ওঠ—চল। তুমি সব খোলাখুলি বল বলেই তোমাকে এত ভাল লাগে আমার। রবিঠাকুর না কে যেন গেয়ে গেছেন—আদেশ করেন যা' মোর গুরুজনে, আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে—

তরুণী ॥ লাভলি! লাভলি! হাউ লাভলি!

[দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়া গেল]

২য় অনুচর ॥ আপনি হুজুর, এত মন দিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিলেন যে! মেয়েটির 'মেক-আপ' দেখছিলেন বুঝি? তবে শুনুন হুজুর, আমারও কেমন সন্দেহ হচ্ছে মেয়েটির লিপস্টিকটা—খুব ঘন মনে হচ্ছিল না কি?

১ম অনুচর ॥ তুমি একটি বুদ্ধু! দেখলে না, যা বলার ছিল, খোলাখুলি বললে দুজনেই। এদের মনে কোন গলদ নেই হে, গলদ নেই। এরা যা চায় ঠিকই চায়। ভুল করে চায় না। না। এরা না। ওই যে, আবার কারা এই দিকে আসছে!

২য় অনুচর ॥ ওরে বাবা! একজনকে চিনি—সাংঘাতিক ডাকাত। সঙ্গের লোকটিকে দেখছি এই প্রথম! সাবধানে থাকবেন হুজুর!

১ম অনুচর ॥ কেন বল তো?

২য় অনুচর ॥ ব্যাঙ্ক লুঠ করেছে ওই ডাকাতটা। জেল হয়েছিল—জেল

ভেঙে পালিয়েছে। খুনও করেছিল। ফাঁসি হতে হতে বেঁচে গেছে। এবার মবলে লোকটা আমাদের দলে ভিড়ে পড়বে দেখবেন। আপনি আপনার মনের মত লোক পাবেন একটি।

১ম অনুচর॥ দেখ যাক, দেখা যাক।

[ডাকাত এবং ভদ্রলোকটির প্রবেশ। ডাকাতটি গম্ভীর। ভদ্রলোকটিকে দেখিলেই বোঝা যায় ধূর্ত।]

ভদ্রলোক॥ তা এতকাল পর হঠাৎ আমাকে তোমার মনে পড়ল যে!

ডাকাত॥ দেখলাম হঠাৎ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছেন আপনি।

ভদ্রলোক॥ হঠাৎ বল না—অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে। বছর পাঁচেক জেলে ছিলে তাই আমার জীবনসংগ্রামের কাহিনীটা তুমি জান না। কিন্তু আমি ভাবছি কি জান, জেল ভেঙে বেরিয়ে এসে তুমি এতদিনও ধরা পড় নি—আশ্চর্য তোমার ক্ষমতা! জেল ভেঙে বেরিয়ে আসাটাই তো একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।

ডাকাত॥ কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার মশাইয়ের আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া। খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছি ভেজালের বাজারের রাজা এখন মশাই।

ভদ্রলোক॥ লোকে ওসব বলে বটে। কিন্তু কেন বলে জান? স্রেফ হিংসা।

ডাকাত॥ আপনার কারখানার তেল ঘি পরীক্ষা করে দেখা গেছে খাঁটি নয়—ভেজাল।

ভদ্রলোক॥ ওটা রটনা। তা যদি হত তা হলে সরকার-বাহাদুর আমাকে ছেড়ে দিতেন? নিকটতম ল্যাম্পপোস্টটাতে আমার মৃতদেহ ঝুলিয়ে ছাড়তেন তাঁরা। যখন বহাল তবিয়তেই রয়েছি, তখন এটা তোমার বোঝা উচিত কোন দোষে দুষ্ট নয় আমার তেল-ঘি। তবে হ্যাঁ, যদি কিছু ওতে মিশিয়েই থাকি, মিশিয়েছি ভাইটামিন। বাড়ি ফেরবার পথে আমার গদি থেকে দেবখন তোমাকে স্যাম্পেল।

ডাকাত॥ ওসব যাদের জন্যে তৈরি করে রেখেছেন, তাদের দেবেন। আমি আপনার ইনস্পেক্টরও নই, গোয়েন্দাও নই। যে জন্য মশাইকে ডেকে এনেছি, সেটা আমি খোলাখুলিই বলছি।

ভদ্রলোক॥ বল—বল ভাই, বল!

ডাকাত। আমাদের সময়টা এখন খারাপ যাচ্ছে। কিছু টাকা এখনই দরকার।

ভদ্রলোক॥ কত?

ডাকাত ॥ হাজার দশেক।

ভদ্রলোক ॥ ওরে বাবা!

ডাকাত ॥ টাকাটা চাই আমি আসছে কাল সন্ধ্যের মধ্যে। কি, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন যে! কি ভাবছেন মশাই? চেঁচিয়ে পুলিশ ডাকবেন? (পকেট হইতে একটি ছোরা বাহির করিয়া তাহা নাচাইতে নাচাইতে) তা ডাকুন।

ভদ্রলোক ॥ না না, তোমাকেও আমি জানি, আমাকেও তুমি জান। আমি হচ্ছি শান্তিপ্রিয় লোক। টাকাটা কোথায় কাকে কখন দিতে হবে?

ডাকাত ॥ সেটা কাল টেলিফোনে আপনাকে জানানো হবে। এটা জেনে রাখুন আমার সঙ্গে আপনার আর সকালে দেখা হচ্ছে না—যদি না আপনি আমাকে নিতান্ত বাধ্য করেন দেখা করতে। পুলিসকে খবর দিয়ে আপনি নিশ্চয়ই বিপদ ডেকে আনবেন না। আশাকরি এটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা আপনার আছে।

ভদ্রলোক ॥ না না, সে কি বলছ? পুলিস থেকে আমি শতহস্ত দূরে থাকতেই অভ্যস্ত। বাঘে ছুলেই আঠারো ঘা।

ডাকাত ॥ আমি যেমন প্রাণ খুলে সব কথাবার্তা বললাম, আশা করি আপনিও তাই বলেছেন। মনে কারও কোনও গলদ রইল না, কেমন?

ভদ্রলোক ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। কাদের যেন পায়ের শব্দ পাচ্ছি। (বিষয়ান্তরে গিয়া) কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে দেখেছেন? কিন্তু ওই চাঁদেরও দিন ঘনিয়ে এসেছে (হাসিতে হাসিতে) গ্যাগারিন—টিটভ্—

ডাকাত ॥ মানুষ যে কত বড় ডাকাত হতে পারে, তবেই বুঝুন মশাই, বুঝুন!

(উচ্চহাস্য করিতে করিতে উভয়ে ওখান হইতে চলিয়া গেল।)

২য় অনুচর ॥ কি বুঝলেন হুজুর? বড় হুজুরের বার্নিশটা কি···

১ম অনুচর ॥ না না, এরা সে লোক নয়। এদের কোন ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। বড় হুজুরের সর্বনাশ যারা করেছে, তাদের কথাবার্তায় দেখবে আগা-গোড়া বার্নিশ করা। আর সে বার্নিশের তুলনা নেই। কেন জানো?

২য় অনুচর ॥ বলুন হুজুর।

১ম অনুচর ॥ সে বার্নিশকে বার্নিশ বলে চেনা যায় না, তাই।

২য় অনুচর ॥ তাজ্জব ব্যাপার! তা এ বার্নিশ বড় হুজুরের কি কাজে লাগত, আমার মাথায় ঢুকছে না হুজুর!

১ম অনুচর ॥ বলেছি তো, সেটা বুঝতে তোমার আর এক জন্ম যাবে। কত যুগ, কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওই রসায়নটি তৈরি করেছিলেন স্বয়ং বড় হুজুর—সে জানি আমরা। সেই অমূল্য মাল যার হাতে পড়েছে, শয়তানিতে বড় হুজুরকেও হারিয়ে দেবে সে। বড় হুজুরের সিংহাসনই দখল করে নেবে।

২য় অনুচর ॥ সাংঘাতিক কথা! বেকার হতে হবে আমাদের?

১ম অনুচর ॥ শুধু আমরা কেন, বেকার হবেন বড় হুজুরও।

২য় অনুচর ॥ তা হলে মৃত্যুবাণ চুরি গেছে বলুন হুজুর!

১ম অনুচর ॥ এতক্ষণে সেটা তোমার খেয়াল হল?

২য় অনুচর ॥ বুঝি। তবে একটু দেরিতে বুঝি। নাঃ, আর একটা জন্ম লাগবেই দেখছি। আচ্ছা হুজুর, এত বড় চুরিটা সম্ভব হল কি করে?

১ম অনুচর ॥ রাবণের মৃত্যুবাণটা চুরি হয়েছিল কি করে?

২য় অনুচর ॥ মন্দোদরীর বোকামিতে।

১ম অনুচর ॥ শয়তানের মৃত্যুবাণও চুরি হয়েছে শয়তানীর শয়তানিতে। তোমার শয়তানীটি কেমন?

২য় অনুচর ॥ আমার মেয়েমানুষটির কথা বলছেন বুঝি?

১ম অনুচর ॥ তা নয় তো তোমার ধর্মপত্নীর কথা বলব? নাঃ, আর এক জন্মেও তোমার হবে না দেখছি।

২য় অনুচর ॥ আঃ, মাস্টারী করতাম বলেই না এই দুর্গতি। সদ্‌গতি হল না। যাক, আপনি জিজ্ঞেস করছেন বলেই বলছি, আমার প্রেয়সী আমাকে ছাড়া আর কিছু জানে না।

১ম অনুচর ॥ খুব খারাপ লক্ষণ। সর্বদা জানবে, প্রদীপের নীচেই অন্ধকারটা গভীর—বিশেষ শয়তানরাজ্যে। লক্ষ্য রাখলে হয়তো দেখবে অরুচি এসে গেছে।

২য় অনুচর ॥ অভয় পেয়েছি বলেই বলছি হুজুর, অরুচিটা এসেছে আমার।

১ম অনুচর ॥ তোমার যখন এসেছে, তার এসেছে আরও আগে। বিশেষ তুমি যখন এখনও এত বোকা। আর বোকা না হলেই বা কি, বড় হুজুর তো বোকা নন। কিন্তু তিনিও একদিন চমকে উঠলেন, যখন দেখলেন, তাঁর সিন্দুকটি খুলে বার্নিশের টিনটি খুলতে যাচ্ছেন তাঁরই প্রেয়সী।

২য় অনুচর ॥ বার্নিশের টিনে তার আবার কি দরকার হল হুজুর!

১ম অনুচর ॥ চোখে ধুলো দিতে দরকার হয় ওই রসায়ন। ঘষে মেজে পালিশ করে লাগাও ওই বার্নিশ, দেখবে গলদ নেই কোনখানে। গলদ ঢাকতে ওই

বার্নিশের আর জুড়ি নেই।

২য় অনুচর ॥ তাই বুঝি হুজুরাইন নিজের গলদ ঢাকতে ওই বার্নিশের টিনটা—

১ম অনুচর ॥ হ্যাঁ। যাক, এটা দেখছি তুমি ধরতে পেরেছ।

২য় অনুচর ॥ গলদ তাতে ঢাকা পড়ল?

১ম অনুচর ॥ তা যদি পড়ত, সে বরং ভাল ছিল। টিনটা ঘরেই থাকত। কিন্তু আমাদের বড় হুজুর গেলেন চটে। প্রেয়সীর হাত থেকে কেড়ে নিতে গেলেন টিনটা। হল একটা ধস্তাধস্তি। টিনটা ছিটকে যে কোথায় গিয়ে পড়ল, আর পাওয়া গেল না। কে যে সেটা চুরি করল, তাও জানা গেল না আজ পর্যন্ত। (দুইজন আগন্তুককে দেখিয়া) এরা আবার কারা?

২য় অনুচর ॥ এ দেশের প্রিয় নেতা আর তার এক প্রিয় সহচর।

[নেতা ও তাহার সহচরের প্রবেশ]

নেতা ॥ এখানে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ভাল লাগে না আর তোমাদের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাতাস। এস, বস।

সহচর ॥ কিন্তু আপনার যা প্রোগ্রাম তাতে দশ মিনিটের বেশী এখানে বসা আপনার চলবে না সার্। আর এই দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের প্রচার সম্পর্কে আপনার গোপনীয় উপদেশ আমাকে নোট করে নিতে হবে।

নেতা ॥ ওহে, সেটা আমি জানি। সাঙ্গোপাঙ্গদের এড়াবার জন্যেই বায়ু-সেবনের নাম করে তোমাকে নিয়ে চলে এসেছি এখানে। এখন বল, কি তোমার সমস্যা?

সহচর ॥ (নোট নেবার উদ্দেশ্যে পকেট বই খুলিয়া) প্রতিবেশী রাজ্যের উদগ্র লালসা। আমাদের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ।

নেতা ॥ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার বার্নিশটা লাগিয়ে দাও। তারপর—

সহচর ॥ দেশের খাদ্যসমস্যা।

নেতা ॥ আঃ! শতবার্ষিকী পরিকল্পনার বার্নিশটা কি ফুরিয়ে গেছে?

সহচর ॥ ফুরিয়ে যায় নি, যাব যাব করছে। আচ্ছা, সে না হয় হল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি—এ সমস্যাটা?

নেতা ॥ ত্যাগ-স্বীকারের বার্নিশটা?

সহচর ॥ সেটা ফুরিয়ে এসেছে।

নেতা ॥ তলানি পড়ে নেই কিছু?

সহচর ॥ তা হয়তো আছে।

নেতা ॥ তাই দিয়ে দাও। নাও, এবার চল, উঠি।

সহচর ॥ কিন্তু আরও কতকগুলো সমস্যা—যেমন গৃহসংস্থান, পরিবহন, মূলত-শিক্ষা, হাসপাতালে স্থানাভাব, সর্বোপরি বেকার সমস্যা, এগুলো সম্পর্কে—

নেতা ॥ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) সবই জাতীয় পরিকল্পনায় খাতে পড়ছে।

সহচর ॥ খাদে পড়েছে! সে কি স্যার?

নেতা ॥ খাদে নয়—খাতে। উন্নয়নের বার্নিশ লাগাও। (চলিলেন)

সহচর ॥ (পিছু নিয়া) আর স্যার, সেই ভাষা-সমাস্যাটা—

নেতা ॥ ওটা আবার সমস্যা নাকি হে? অহিংসার সঙ্গে জাতীয় সংহতি মিশিয়ে পালিশ করে দাও।

সহচর ॥ স্যার, শুনুন।

নেতা ॥ না হে, আর সময় নেই। (উভয়ে চলিয়া গেল)

১ম অনুচর ॥ (বড় হুজুরের উদ্দেশে চিৎকার করিয়া) বড় হুজুর! বড় হুজুর শুনছেন?

(শয়তানের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতে লাগিল)

শয়তান ॥ শুনলাম। টিনটা উদ্ধার করতে পার?

১ম অনুচর ॥ যে হাতে ওটা গিয়ে পড়েছে, সে বড় কঠিন ঠাঁই হুজুর।

শয়তান ॥ কেন হে? কত কি সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছ তুমি, এখানে পিছপাও হচ্ছ কেন?

১ম অনুচর ॥ বার্নিশের শক্তিটা হুজুর ভুলে যাচ্ছেন। কোন অশান্তি করতে গেলেই আমাদের ঘষে মেজে বিশ্বশান্তির বার্নিশ দিয়ে পালিশ করে দেবে।

শয়তান ॥ তবে আর কি, সিংহাসনটা আমার গেল।

২য় অনুচর ॥ ভালই হল। বড় হুজুর আজ থেকে দেবতা হয়ে গেলেন। আর সেই সঙ্গে আমরাও।

শয়তান ॥ হ্যাঁ, এইটেই আমার এখন একমাত্র সান্ত্বনা, একমাত্র সান্ত্বনা—একমাত্র সান্ত্বনা—

॥ যবনিকা ॥

একটি রাজকীয় মৃত্যু

[পুরাকাল। রাজপ্রাসাদে রাজার একান্ত কক্ষ। ময়ূরাসনে অর্ধ-শায়িত রাজা। পার্শ্বে দণ্ডায়মানা রাণী। দ্বারদেশে দ্বারপাল। দূর হইতে জনতার কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যা]

রাজা॥ ও কিসের গর্জন? তুমি শুনতে পাচ্ছ না রাণী?

রাণী॥ প্রজাপুঞ্জের কোলাহল।

রাজা॥ প্রজাপুঞ্জের কোলাহল? মনে হচ্ছে সমুদ্রের গর্জন। জনতার এই সমাবেশ রাজপ্রাসাদে কেন? কী দুঃসাহস! বারণ করছে না কেউ? বিদ্রোহ নয় তো রাণী?

রাণী॥ (হাসিয়া) না প্রভু, বিদ্রোহ নয়। বরং রাজভক্তির অকপট উচ্ছ্বাস।

রাজা॥ প্রমাণ কি?

রাণী॥ বিদ্রোহী হ'লে তাদের হাতে অস্ত্র থাকতো···এরা নিরস্ত্র। বিদ্রোহী হলে তাদের মুখে থাকতো কটূক্তি, এদের মুখে রয়েছে প্রার্থনা। তোমার আরোগ্যের জন্য সকাতর প্রার্থনা।

রাজা॥ আমার আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা! আমি যে অসুস্থ একথা তারা জানলো কি করে? কার এই প্রচার?

রাণী॥ রাজপ্রাসাদে থেকেও আজ তিন দিন তুমি রাজসভায় অনুপস্থিত। প্রজাদের কল্পনা-শক্তি অবাধ।

রাজা॥ কি বিপদ! আমি যে অসুস্থ একথা এক তুমি ভিন্ন আর কারুর কাছে এখনো করিনি প্রকাশ। রাজবৈদ্যকেও আহ্বান করিনি এখনো।

রাণী॥ সেটা উচিত হয়নি রাজা। এই গোপনতার দরুণই আজ অন্ত নেই জল্পনা-কল্পনার। আর দু-একদিন তোমার একান্ত কক্ষে নিজেকে যদি এমনি ক'রে গোপন রাখো স্বকর্ণেই হয়তো তোমাকে শুনতে হবে নিজের মৃত্যু রটনা। সিংহাসনের স্বত্ব নিয়ে বেধে যাবে সংঘাত, দেখা দেবে বিদ্রোহ, শুরু হবে যুদ্ধ।

রাজা॥ সাংঘাতিক—কি সাংঘাতিক!

রাণী॥ আমি বুঝি না কেন তুমি এমন করে আত্মগোপন করে রয়েছ রাজা!

রাজা ॥ জানো না রাণী কি নিদারুণ আমার অসুখ, কি দুরন্ত আমার ব্যাধি।

রাণী ॥ (হাসিয়া) আমি কিন্তু তোমাকে এত সুস্থ কখনো দেখিনি রাজা। আর যদি সত্যই অসুস্থ হয়ে থাকো, সে অসুখ জানবে না তোমার প্রিয়তমা?

রাজা ॥ প্রিয়তমা! তুমি বুঝবে না, বলেও তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না কি নিদারুণ আমার যন্ত্রণা। ওঃ!

[বলিতে বলিতে রাজার চোখে-মুখে দেহে এক নিদারুণ যন্ত্রণার অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হইল। রাণী বিচলিত হইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন]

রাণী ॥ কি যন্ত্রণা, কোথায় যন্ত্রণা! বলো ওগো আমাকে বলো

রাজা ॥ আঃ, ওঃ।

রাণী ॥ রাজবৈদ্যকে আমি ডাকি। ওরে কে আছিস—

রাজা ॥ না, না, রাজবৈদ্য নয়। তোমার এই শুশ্রূষাও আমার বিষবৎ বোধ হচ্ছে। তুমি এখান থেকে চলে যাও, চলে যাও রাণী।

রাণী ॥ আমার শুশ্রূষা তোমার বিষবৎ বোধ হচ্ছে রাজা!

রাজা ॥ হ্যাঁ, বিষবৎ। বিষবৎ। আঃ উঃ।

রাণী ॥ বেশ, আমি চলে যাচ্ছি, পাঠিয়ে দিচ্ছি কোনো সেবিকা কি ধাত্রী। (প্রস্থানোদ্যত)

রাজা ॥ (চিৎকার করিয়া) শোনো, শোনো।

রাণী ॥ (ফিরিয়া) বলো।

রাজা ॥ পাঠিয়ে দাও তোমার তৃষাকে।

রাণী ॥ তৃষা! আমার যবনী ক্রীতদাসী?

রাজা ॥ হ্যাঁ তোমার যবনী ক্রীতদাসী। (কামার্ত কণ্ঠে) অমন দেহসৌষ্ঠব তোমার নেই। গাত্রসংবাহনে অদ্বিতীয়া সে।

রাণী ॥ সে গাত্রসংবাহন করে আমার। তার গুণপনা জানবার কথা আমার, তোমার নয়।

রাজা ॥ আমি জেনেছি বসন্তোৎসবের এক রাত্রে যখন তুমি মদিরাচ্ছন্না হয়ে বিগতচেতনা, নিদ্রাভিভূতা, তখন—তখন। তখন আমি তোমার তৃষাকে—

রাণী ॥ তুমি থামো! তুমি থামো!

রাজা ॥ সেই রাত্রি থেকে আমার স্বপ্নে আমার জাগরণে ওই তৃষাই, আমার দুর্নিবার তৃষ্ণা।

রাণী ॥ চুপ চুপ। (দ্বারপালকে) দ্বারপাল, তুমি এখান থেকে চলে যাও।

[দ্বারপালের প্রস্থান]

রাণী ॥ আমি জানতাম না, তোমার এ অধঃপতন—আমি জানতাম না। বেশ, আমি তৃষাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার কাছে। যতো যন্ত্রণাই হোক আমার, তোমার যন্ত্রণা দূর হোক। কিন্তু পাঠিয়ে দিচ্ছি এক শর্তে। সে আসবে গোপনে, ফিরে যাবে গোপনে। [রাণী চলিয়া যাইতেছেন।]

রাজা ॥ (সহজ কণ্ঠে) দাঁড়াও রাণী। (হাসিয়া) আর তার দরকার নেই রাণী।

রাণী ॥ (আশ্চর্যান্বিতা হইয়া) সে কি? তোমার যন্ত্রণা?

রাজা ॥ যন্ত্রণা আর আমার নেই।

রাণী ॥ (সবিস্ময়ে) সে কি!

রাজা ॥ আমি সত্য বলছি রাণী, এ আমার এক অদ্ভুত ব্যাধি। জগতে এমন ব্যাধিতে আর কেউ ভুগছে কিনা জানি না রাণী। কিছু দিন থেকে আমার এই অদ্ভুত ব্যাধির হয়েছে সূত্রপাত।

রাণী ॥ কিন্তু ব্যাধিটা কি? কী তার নাম?

রাজা ॥ কি যে নাম, জানি না, জানি না রাণী। কিন্তু লক্ষণটা আমি বলতে পারি। আমি বলছি। আমার গলাটা শুকিয়ে গেছে, পানীয় দাও আমাকে।

[রাণী পানীয় দিলেন। রাজা পান করিলেন]

রাজা ॥ আজ কিছু দিন থেকে লক্ষ্য করছি মনের গুপ্ততম কোঠায় যে সত্য-গুলিকে আমি বন্দী করে রেখেছিলাম, আমি যেন আর তাদের বন্দী করে রাখতে পারছি না রাণী। আমার সত্তার মধ্যে কোথায় যেন কি শিথিল হয়ে গেছে রাণী। এক একটা সত্য বেরিয়ে আসতে চায়, প্রকাশ হতে চায়, আমি এত চেষ্টা করেও তাদের রোধ করতে পারি না। এই যুদ্ধটা শুরু হয় তখনই যখন শুরু হয় আমার যন্ত্রণা! কিন্তু, কিন্তু রাণী আমাকে পরাজিত পরাভূত করে আমারি কণ্ঠ থেকে সত্যটা যখন বেরিয়ে আসে—প্রকাশ পায়—তখন—তখনই আমার যন্ত্রণা হয় দূর, আর তখনই আমার শান্তি।

রাণী ॥ তৃষা! এক ক্রীতদাসী।

রাজা ॥ কি ভাবছো রাণী?

রাণী ॥ দেবতাকে আমরা পূজা করি, কিন্তু সে দেবতা যে মাটি দিয়ে গড়া তা আমরা ভুলে যাই রাজা। কি ক্লেদাক্ত সেই মাটি!

রাজা ॥ তুমি মিথ্যা বলোনি রাণী।

রাণী ॥ কিন্তু তুমি যে এতোটা ক্লেদাক্ত হতে পারো রাজা, কখনো কল্পনাও করতে পারিনি আমি। বেশ, যন্ত্রণা যখন তোমার দূর হয়েছে আমি তবে আসি। তৃষা! শেষে কিনা একটা ক্রীতদাসী!

রাজা ॥ আমার চোখের দিকে একটি বার চাও তো রাণী। (রাণী তাকাইলেন) বাইরে তুমি প্রশান্ত কিন্তু আমি তোমার অন্তরটা দেখতে পাচ্ছি রাণী সেখানে একটা ঝড় উঠেছে। (হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে) কিন্তু সাবধান রাণী, তৃষা থাকবে, যেমন আদরে ছিল সেই আদরেই যেন থাকে। বুঝেছ?

রাণী ॥ (চমকাইয়া উঠিয়া) এ্যাঁ!

রাজা ॥ হ্যাঁ।

রাণী ॥ আপত্তি নেই রাজা, কিন্তু তৃষা থাকবে একটা শর্তে।

রাজা ॥ বলো—

রাণী ॥ আমি তোমার প্রিয়তমা। এই মিথ্যাটাই যেন রটনা থাকে রাজা।

রাজা ॥ হুঁ।

রাণী ॥ হ্যাঁ। রাজার প্রেম হারিয়েছি; কিন্তু রাণীর সম্মানটা যেন না হারাই। সেটা হারালে হবে আমার মৃত্যু।

রাজা ॥ (রাণীকে সস্নেহে আদর করিয়া) আমি কথা দিচ্ছি রাণী আমি প্রাণপণ চেষ্টা করবো তোমার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে—তুমিই আমার প্রিয়তমা এই মিথ্যাটি সাড়ম্বরে ঘোষণা করতে। [দ্বারপালের প্রবেশ]

দ্বারপাল ॥ মহামন্ত্রী দর্শনপ্রার্থী মহারাজ।

রাজা ॥ বলো আমি অসুস্থ।

রাণী ॥ না মহারাজ আপনি মহামন্ত্রীকে দর্শন দান করুন। হয়তো গুরুতর সংবাদ আছে, এখনি মন্ত্রণ আবশ্যক।

রাজা ॥ আমার মৃত্যু রটনা হয়েছে বলে কি তোমার আশঙ্কা রাণী?

রাণী ॥ আমি জানি না, জানি না রাজা। দ্বারপাল, মহামন্ত্রী আসুন।

[দ্বারপালের প্রস্থান]

রাজা ॥ তুমি কি এখানে থাকছো রাণী?

রাণী ॥ মহামন্ত্রী কি সংবাদ এনেছেন জানবার জন্য আমি ব্যাকুল রাজা।

[মহামন্ত্রীর প্রবেশ।]

মহামন্ত্রী ॥ মহারাজের জয় হোক। এই যে মহারাণীও আছেন। মহারাণীরও

জয় হোক আশঙ্কা করছিলাম মহারাজা না জানি কত অসুস্থ। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে সামান্য কোনো ব্যাধি। অথচ দেখুন ঘটনার কোন অন্ত নেই। কেউ একথাও বলছে।

রাজা॥ মহারাজের মৃত্যু হয়েছে এই আশঙ্কাই করেছিলেন আমার রাণী, আমার এই প্রিয়তমা রাণী

['প্রিয়তমা' কথাটি কণ্ঠ হইতে নির্গত হওয়া মাত্রই রাজার যেন শূল বেদনা উপস্থিত হইল।]

রাজা॥ (চরম যন্ত্রণায়) উঃ আঃ, প্রিয়তমা ঠিক নয়—ওঃ আঃ।

মহামন্ত্রী॥ এ কি, এ কি হল আপনার মহারাজ?

রাজা॥ (যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে) শূল বেদনা। সত্যটা বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু আমি আটকাতে পারছি না, পারছি না।

মহামন্ত্রী॥ কে আছো, রাজবৈদ্যকে ডেকে আনো।

রাজা॥ এ ব্যাধি কেউ সারাতে পারবে না, কেউ না। সারাতে পারি শুধু আমি, ওষুধ আছে শুধু একটি—রাণী, রাণী আমাকে ক্ষমা করো—

[দু হাতে মুখ ঢাকিয়া রাণী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন]

রাজা॥ ওই রাণীকে আমি ভালবাসি না, ও আমার প্রিয়তমা নয়, আমার প্রিয়তমা ওই রাণীরই যবনী ক্রীতদাসী। (যন্ত্রণা সঙ্গে সঙ্গে দূর হইল)

মহামন্ত্রী॥ যন্ত্রণাটা যেন আর নেই মনে হচ্ছে মহারাজ।

রাজা॥ হ্যাঁ, সত্যটা বমন করার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাটা আমার গেছে।

মহামন্ত্রী॥ কি বমন করার সঙ্গে সঙ্গে?

(রাজা বুঝিলেন মন্ত্রীর সমক্ষে তাঁহার আচরণ এবং বাক্য, কোনোটিই শোভন ও সঙ্গত হয় নাই। তিনি একটু লজ্জিতই হইলেন।)

রাজা॥ এ্যা, না, এ সব আপনি বুঝবেন না মন্ত্রী। যাকে বলে 'দাম্পত্য কলহ'—এই আর কি।

মহামন্ত্রী॥ তাই বলুন মহারাজ। অসুখ-বিসুখ তবে কিছু নয়। (খুশি হইয়া) 'দাম্পত্য কলহ' মানেই 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'। আমিও তাই ভাবছিলুম। (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) কিন্তু মহারাজ একটা কথা না বলে পারছি না।

রাজা॥ বলুন।

মহামন্ত্রী॥ বহির্জগতের সামনে, বিশেষ আমার সামনে, মহারাণীর সঙ্গে আপনার ঐরূপ আচরণ, সে আপনি কলহই বলুন রসিকতাই বলুন, না হয়েছে

শোভন, না হয়েছে সঙ্গত।

রাজা॥ আপনি যথার্থ বলেছেন মহামন্ত্রী। আমি বুঝতে পারছি অন্যায় করেছি আমি। আর এরূপ অন্যায় করাই আমার একটা ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। বাক্‌সংযম আমি হারিয়ে ফেলেছি মহামন্ত্রী। আর সেজন্যই আমি সবিনয় নিবেদন করছি আপনিও এখান থেকে এখন প্রস্থান করুন।

মহামন্ত্রী॥ প্রস্থান করবো কি মহারাজ। আপনি নিজেকে এই কক্ষে আবদ্ধ রেখেছেন, রাজসভা পরিত্যাগ করেছেন, রাজকার্য অচল হওয়ার উপক্রম হয়েছে। নিরুপায় হয়ে আমিই আসতে বাধ্য হয়েছি গুরুতর রাজকার্য নিয়ে।

রাজা॥ আনন্দিত হলাম মহামন্ত্রী। কিন্তু আমার বাক্‌সংযম নষ্ট হলে আপনি যেন রুষ্ট হন না এই রইল নিবেদন। ঐ ভয়ে আমি রাজসভা করেছি বর্জন, লোকসমাজ করেছি ত্যাগ। এইবার বলুন কি আপনার গুরুতর রাজকার্য।

(মহামন্ত্রী রাজার সম্মুখে একটি পত্রিকা উপস্থাপিত করিলেন)

রাজা॥ এ-টা কি?

মহামন্ত্রী॥ আগামী বৎসরের জন্য রাজ্যের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের মঞ্জুরীপত্র। এতে আপনার স্বাক্ষর আবশ্যক।

রাজা॥ এতে, শিক্ষার জন্য আয়ের শতকরা দশ ভাগ নির্দিষ্ট হয়েছে, না মহামন্ত্রী?

মহামন্ত্রী॥ হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা॥ কে যেন বলছিল শিক্ষার জন্য এই ব্যয় নিতান্ত সামান্য।

মহামন্ত্রী॥ বলেছিলেন আপনি।

রাজা॥ কেন যেন বলেছিলাম আমি?

মহামন্ত্রী॥ বামাবর্তের প্রজাপুঞ্জ শিক্ষার বিস্তারের জন্য, শিক্ষার প্রসারের জন্য আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দাবী জানিয়েছিল।

রাজা॥ কিন্তু সে দাবী আমরা মানি নি। কেন যেন মানি নি মহামন্ত্রী?

মহামন্ত্রী। দক্ষিণাবর্তের প্রজাপুঞ্জ শিক্ষা বিস্তারের চেয়েও স্বাস্থ্যের উন্নতি, পথঘাটের প্রসার, বাণিজ্যের বিস্তার, কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ এবং সংস্কৃতি-মূলক কলাচর্চা এই সবই জাতি উন্নয়নের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে দাবী করেন। স্মরণ রাখবেন মহারাজ, দক্ষিণাবর্তের প্রজাপুঞ্জই এ রাজ্যের স্তম্ভ।

রাজা॥ শিক্ষিতের সংখ্যা ওদের মধ্যেই বেশী। কি বলেন মহামন্ত্রী?

মহামন্ত্রী ।। হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা।। বামাবর্তের প্রজাপুঞ্জ বেশির ভাগই অশিক্ষিত আর দরিদ্র, নয় মহামন্ত্রী?

মহামন্ত্রী ।। হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা।। তাই ওদের মধ্যে যে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত নেতা আছেন, তাঁরাই শিক্ষার প্রসারের জন্য আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দাবী করেছেন।

মহামন্ত্রী ।। (হাসিয়া) আত্মঘাতী দাবী। জীবনের পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বাস্থ্য সম্পদ সে স্বাস্থ্য সম্পদ নির্ভর করে পুষ্টিকর খাদ্যের উপর। জাতির সম্পদ নির্ভর করে ব্যবসাবাণিজ্যের ওপর। দারিদ্র্য দূরীকরণে, জাতীয় উন্নয়নে এদেরই অগ্রাধিকার। জাতি শৌর্যে-বীর্যে উন্নত হলে, আচার-ব্যবহার সংস্কৃতি সম্পন্ন হলে, শিক্ষার অভাব দূর হতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু শিক্ষিত জাতি যদি মেরুদণ্ডহীন হয় তার ধ্বংস অনিবার্য।

রাজা।। এটা দক্ষিণাবর্তের কথা। বামাবর্তের দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। তাঁরা বলেন, জাতির শতকরা আশী জন লোকই আজ অশিক্ষিত। অশিক্ষা এবং কুশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাই নেই তাদের মনুষ্যত্বের চেতনা, দেশাত্মবোধের প্রেরণা। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক তাদের যেভাবে বঞ্চনা করছে, শোষণ করছে পেষণ ও পীড়ন করছে, সে সম্বন্ধেও তাদের নেই কোনো ধারণা। এ রাজ্যে পশুপালের মতো তারা বিচরণ করছে। তাই তারা দাবী করে ব্যাপক শিক্ষার। পশু জীবন থেকে উত্তরণ চায় মনুষ্য জীবনে।

মহামন্ত্রী ।। কিন্তু সেই শিক্ষার জন্য তবে ব্যয় করতে হবে আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। তাতে কৃষিকার্যের উন্নতি বন্ধ হবে। খাদ্যাভাব দেখা দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সৈন্য-সামন্ত বিদায় দিতে হবে। প্রজাবিদ্রোহ মাথা তুলে দাঁড়াবে। বিদেশী রাজ্য হানা দেবে। স্বাধীনতা যাবে। সম্মত মহারাজ?

রাজা।। না।

মহামন্ত্রী ।। একথা আপনাকে কতবার বলেছি। আপনি কেন যে বুঝেও বোঝেন না, বুঝি না, মহারাজ।

রাজা।। এই চোর চুপ। বুঝি আমি সবই।

মহামন্ত্রী ।। চোর! (বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে) মহারাজ!

রাজা।। আগেই বলেছি মহামন্ত্রী, বাক্ সংযম আমি হারিয়েছি; আমি

বলেছিলাম চলে যাও—চলে যাও এখান থেকে। তুমি যাওনি।

মহামন্ত্রী ।। এটা স্বাক্ষর করে দিন, আমি এখনি চলে যাচ্ছি।

রাজা ।। দক্ষিণাবর্ত আর বামাবর্ত—দুই প্রজা প্রতিনিধির সামনে আমি স্বাক্ষর করব ঐ মঞ্জুরীপত্র। আহ্বান কর তাদের।

মহামন্ত্রী ।। কিন্তু—

রাজা ।। আবার আমার সেই যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, নিদারুণ সেই শূল বেদনা। (চীৎকার করিয়া) কে আছিস, সমবেত প্রজাপুঞ্জের মধ্য থেকে ডেকে আন দক্ষিণাবর্ত আর বামাবর্ত প্রজা-প্রতিনিধিদ্বয়কে। এখনি এখনি। তৃষা! তৃষা!...সত্যটা যমন না করলে দূর হবে না আমার যন্ত্রণা। শোন মন্ত্রী, আমার প্রিয়তমা রাণী নয়, প্রিয়তমা আমার তৃষা, রাণারই যবনী ক্রীতদাসী।...তৃষা! তৃষা! কোথায় তুমি।

(তৃষার উদ্দেশে উদ্‌ভ্রান্তভাবে রাজার কক্ষান্তরে প্রস্থান। অন্য দ্বারপথে রাজবৈদ্যসহ রাণীর প্রবেশ)

মহামন্ত্রী ।। একথা সত্য মহারাণী?

রাণী ।। কি কথা মহামন্ত্রী?

মহামন্ত্রী ।। ঐ তৃষার কথা—মুখে আনতেও যা বাধছে।

রাণী ।। সত্য--সত্য—সত্য মহামন্ত্রী। আপনার মুখে যা বাধছে ওর মুখে তা বাধছে না। বুঝুন কি নির্লজ্জতা।

মহামন্ত্রী ।। যেভাবে সেই নারীর উদ্দেশ্যে ছুটলেন তাকে উন্মত্ততা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।

রাণী ।। ঐ উন্মত্ততাই এখন ওর ব্যাধি।

মহামন্ত্রী ।। রাজবৈদ্য!

রাজবৈদ্য ।। কামোন্মাদ লক্ষণটি প্রকাশিত হয়েছে কবে?

রাণী ।। আজ।

রাজবৈদ্য। রমণীটি দর্শন করেছেন কবে?

রাণী ।। বৎসরকাল পূর্বে।

রাজবৈদ্য ।। বৎসরকাল পূর্বে! যে ব্যাধি শুরু হয়েছে বৎসরকাল পূর্বে তার লক্ষণ প্রকাশ পেল আজ প্রথম!

রাণী ।। হ্যাঁ।

রাজবৈদ্য ।। এই এক বৎসরকাল শুধু দর্শনেই কি ক্ষান্ত ছিলেন রাজা?

রাণী ॥ হ্যাঁ।

মহামন্ত্রী ॥ আপনার অজ্ঞাতসারেও কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে রাণী?

রাণী ॥ না তা ঘটেনি। তা ঘটা অসম্ভব। মহারাজা আমাকে বলেছেন বটে, গত বসন্তোৎসবে আমি যখন মদিরাচ্ছন্ন ছিলাম তখন—তখন কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমার বিশ্বস্ত দেহরক্ষীরা ছিল সেখানে উপস্থিত। তারা স্বল্পভাষী, কিন্তু মূক নয়।

রাজবৈদ্য ॥ হুঁ। প্রধান লক্ষণ তবে ওঁর এই, অবৈধ গুপ্ত প্রেম ব্যক্ত করতে উনি লজ্জিত হচ্ছেন না।

রাণী ॥ হ্যাঁ।

মহামন্ত্রী ॥ শুধু তাই নয়, বাক্‌সংযম উনি হারিয়ে ফেলেছেন। আমাকে—আমাকে—, যাক মোটের উপর জেনে রাখুন ওঁর আর লঘুগুরু জ্ঞান নেই, যাকে যা খুশী বলছেন।

রাণী ॥ আসল কথা মনের গুহ্যতম কথাটিও আর চেপে রাখতে পারছেন না, চেষ্টা করেও পারছেন না।

রাজবৈদ্য ॥ সুদীর্ঘ এক বৎসর একটি পরম সত্যকে অবদমন করে রাখার ফলেই দাঁড়িয়েছে এই ব্যাধি।

মহামন্ত্রী ॥ এখন প্রতিকার?

রাজবৈদ্য ॥ প্রতিকার আছে বৈকি। (একটু ভাবিয়া) হ্যাঁ, চিকিৎসা আছে।

রাণী ॥ কি চিকিৎসা?

রাজবৈদ্য ॥ সত্যকে সত্যই হতে দিন মহারাণী।

মহারাণী ॥ কখনো না।

মহামন্ত্রী ॥ এ আপনার নিষ্ফল আর্তনাদ মহারাণী। মহারাজ বোধ হয় এতক্ষণ তাঁর ঔষধ পেয়ে গেছেন? সেবনও করে থাকবেন। জানবেন মহারাণী, রাজ্যের স্বার্থেই আমি মহারাজের আরোগ্য কামনা করছি।

রাণী ॥ কিন্তু আমাকে আমার স্বার্থও দেখতেও হবে মহামন্ত্রী। যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে আমার সম্মান, আমার প্রতিষ্ঠা আমি রাখব। রাজবৈদ্য, আপনি অন্য ঔষধ স্মরণ করুন। জেনে রাখুন সেই ক্রীতদাসী রাজার অলভ্যা।

মহামন্ত্রী ॥ নিহত?

রাণী ॥ (সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া) আপনি অন্য কোন ঔষধ স্মরণ করুন রাজবৈদ্য।

রাজবৈদ্য ॥ তা ছাড়া গত্যন্তর কি!

মহামন্ত্রী ॥ আছে কি এমন কোন ঔষধ?

রাজবৈদ্য ॥ কেন থাকবে না? কিন্তু সেক্ষেত্রে আরোগ্য সময়সাপেক্ষ। দীর্ঘকাল চিকিৎসা আবশ্যক।

মহামন্ত্রী ॥ দীর্ঘকাল। সর্বনাশ। (বিপন্ন দৃষ্টিতে) মহারাণী!

রাণী ॥ বলুন।

মহামন্ত্রী ॥ আপনি কি আপনার স্বামীর আশু আরোগ্য কামনা করেন না মহারাণী?

রাণী ॥ কোনো স্ত্রীকে এরূপ প্রশ্ন করা অর্বাচীনতা।

মহামন্ত্রী ॥ আপনার এ তিরস্কারে আমি অনুপ্রাণিত হচ্ছি মহারাণী। আর সেইজন্যই পুনরায় প্রশ্ন করছি, সেই ক্রীতদাসী কি জীবিত?

রাণী ॥ তবে শুনুন মহামন্ত্রী আমি সেই নারী, যে স্বামীর চেয়েও স্বামীর সম্মানকে বড় মনে করে। শুধু তাই নয়—মহামন্ত্রী, আমি সেই নারী, যে স্বামীর চেয়েও আত্মসম্মানকে বড় মনে করে। স্বামীকে আমি লোকচক্ষে হেয় হতে দিতে পারব না, নিজেও আমি হেয় হতে পারব না লোকচক্ষে।

[কক্ষান্তরে প্রস্থান।]

মহামন্ত্রী ॥ সত্য যখন সত্য হতে পারছে না রাজবৈদ্য, তখন অন্য ঔষধ স্মরণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই আপনার। কিন্তু সাবধান রাজবৈদ্য, আরোগ্য সময় সাপেক্ষ করলে চলবেনা। রাজার আরোগ্য চাই আমরা আজ এখুনি এখানে। এই রাজপত্রে তাঁর স্বাক্ষর আজই আবশ্যক।

রাজবৈদ্য ॥ এ আপনি বলছেন কি মহামন্ত্রী? ঔষধ প্রয়োগ-মুহূর্তে এই ব্যাধি আরোগ্য করা স্বয়ং ধন্বন্তরীরও অসাধ্য।

মহামন্ত্রী ॥ সাবধান রাজবৈদ্য। সর্বদা স্মরণ রাখবেন আমাদের রাজার প্রাণ অমূল্য। আর, রাজকার্যের জন্য রাজার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতি মূল্যবান। বিবেচনা করে দেখুন বহু অন্ন বহুকাল ধ্বংস করেছেন আপনি এই রাজার, প্রতিদানে আপনি অবিলম্বে এমন কোনো ঔষধ প্রয়োগ করুন যাতে রাজার রোগমুক্তি ঘটে আজই, এখনি, এখানে।

[রাজবৈদ্য তাঁহার পুঁথি ব্যস্ততার সহিত ঘাঁটিয়া দেখিতে লাগিলেন।]

মহামন্ত্রী ॥ শুনুন রাজবৈদ্য, কিছুকাল পূর্বে রাজার মুখে একটি দুষ্ট ব্রণের আবির্ভাব হয়েছিল; অসহ্য ছিল তার যন্ত্রণা। সেই দুষ্ট ব্রণ দূর করতে

আপনি সময় নিয়েছিলেন মাত্র দুটি দিন।

রাজবৈদ্য ॥ স্বল্পতম সময়ই নিয়েছিলাম আমি।

মহামন্ত্রী ॥ আমি জানি, আমি তা বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি যা জানেন না সে-টা বলছি আমি আজ।

রাজবৈদ্য ॥ (সভয়ে) কি?

মহামন্ত্রী ॥ দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে যন্ত্রণা-কাতর রাজা আদেশ দিয়েছিলেন আপনার শিরশ্ছেদ করতে।

রাজবৈদ্য ॥ (সভয়ে) এঁ্যা?

মহামন্ত্রী ॥ হঁ্যা। আমি অনুনয় করে আপনার প্রাণ রক্ষা করেছিলাম সেদিন।

রাজবৈদ্য ॥ কি সাংঘাতিক।

মহামন্ত্রী ॥ সেই হঠকারী রাজা আজ তাঁর এই নির্লজ্জ ব্যাধি সম্পর্কে এত সচেতন যে আজ তিন দিন আত্মগোপন করে রয়েছেন তাঁর এই একান্তকক্ষে। রাজকার্যের যা ক্ষতি হচ্ছে তা অবর্ণনীয়। তাই রাজার আদেশেই আহ্বান করা হয়েছে আপনাকে। রাজার একান্ত কামনা আপনি তাঁকে নিরাময় করবেন একটি মাত্রা ঔষধে। আর তা যদি আপনি না পারেন জানবেন শিরশ্ছেদ আপনার অনিবার্য।

রাজবৈদ্য ॥ এঁ্যা?

মহামন্ত্রী ॥ হঁ্যা। তাই ইষ্ট নাম স্মরণ করে ঔষধ প্রস্তুত করুন একমাত্রা—এমন একমাত্রা যাতে আপনার প্রাণটি রক্ষা হয় আজ।

[মন্ত্রীর ইঙ্গিত বুঝিয়া রাজবৈদ্য ঔষধ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। দেখা গেল রাজা আসিতেছেন। রাণী তাঁহাকে ধরিয়া রহিয়াছেন, রাজার মুখে বেদনার অভিব্যক্তির চেয়ে প্রস্তরের কাঠিন্য বেশি পরিস্ফুট। রাজা মন্ত্রীর সামনে আসিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।]

রাজা ॥ (মন্ত্রীকে) স্বাক্ষর?

মহামন্ত্রী ॥ হঁ্যা মহারাজ।

রাজা ॥ দক্ষিণাবর্ত আর বামাবর্তের প্রজা-প্রতিনিধি—কোথায় তারা।

দ্বারপাল ॥ তারা দ্বারে অপেক্ষারত মহারাজ।

রাজা ॥ কৈ তাঁরা, এখানে আসুন।

[প্রজা-প্রতিনিধিদ্বয়ের প্রবেশ ও অভিবাদন। সঙ্গে সঙ্গে রাজার সেই অদ্ভুত যন্ত্রণা, সেই শূল বেদনা শুরু হইল।]

রাজা ॥ ওঃ আঃ—প্রাণ আমার বেরিয়ে যাচ্ছে, আমি বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই, সত্যটাকে বমন করে আমি বাঁচতে চাই।

[সকলে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। রাজবৈদ্য খলে সবেগে ঔষধ মর্দন করিতে লাগিলেন। রাণী রাজাকে যথাসম্ভব শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী মস্যাধার হইতে লেখনী তুলিয়া লইয়া বাম হস্তে মঞ্জুরী-পত্র ও দক্ষিণ হস্তে লেখনী লইয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।]

রাজা ॥ শোন দক্ষিণাবর্ত, তোমার কাম্য হচ্ছে অন্ধকার—যে অন্ধকারের সুযোগে দস্যু করে দস্যুতা, শাসক করে শোষণ, প্রবল করে দুর্বলকে পেষণ। আর তুমি বামাবর্ত, তুমি চাইছো সেই অন্ধকার দূর করতে, শিক্ষার আলোকে, যে আলোকে উদ্ভাসিত হবে সমগ্র জাতি, প্রতিষ্ঠিত হবে এক শোষণহীন সমাজ, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতাই যে সমাজের লক্ষ্য।

বামাবর্ত প্রতিনিধি ॥ মহারাজ যথার্থ বলেছেন।

দক্ষিণাবর্ত প্রতিনিধি ॥ মহারাজকে অসুস্থ বোধ হচ্ছে।

মহামন্ত্রী ॥ মহারাজ সত্যই অসুস্থ।

রাজা ॥ সত্যই আমি ভীষণ অসুস্থ বোধ করছি এবং সুস্থ হবার একমাত্র ঔষধ, অকপটে তোমাদের কাছে আজ ঘোষণা করা যে শিক্ষায় ঐ আশ্চর্য শক্তিকে আমি ভয় করি। রাজত্ব করার লোভ রয়েছে আমার, একাধিপত্যের লালসা রয়েছে আমার। আর তা আছে বলেই, ছলে বলে কৌশলে, শিক্ষার অগ্রগতি আমি রোধ করছি। হ্যাঁ, এইবার সত্যটা বমন করে সুস্থ বোধ করছি আমি, শান্তি পাচ্ছি আমি। মহামন্ত্রী, আপনার মঞ্জুরীপত্র—

[মহামন্ত্রী মঞ্জুরীপত্রটি সামনে ধরিলেন। রাজা তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন]

মহামন্ত্রী ॥
দক্ষিণাবর্ত প্রতিনিধি ॥ } মহারাজের জয় হোক্।

বামাবর্ত প্রতিনিধি ॥ আমিও বলছি মহারাজের জয় হোক্। মহারাজের এই স্বীকৃতিতেই অন্ধকারে আলো দেখছি। পর্বত গুহার হাজার বছরের অন্ধকারও নিমেষে দূর হয় যখন তাতে কেউ আলো জ্বালে। আপনার বিবেক যখন আলোকিত হয়েছে আপনার জয় হোক্। [প্রস্থান]

দক্ষিণাবর্ত প্রতিনিধি ॥ স্পষ্টোক্তির জন্য মহারাজকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। যার যত যুক্তিই থাক, আমাদের শুধু এক যুক্তি, শক্তির যুক্তি। বসুন্ধরা চিরদিন চিরকাল বীরভোগ্যা। মহরাজের জয় হোক্। [প্রস্থান]

মহামন্ত্রী ॥ মঞ্জুরীপত্রে স্বাক্ষরের জন্য মহারাজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করছি মহারাজের বাকসংযম আয়ত্ত হোক্।

রাজা ॥ সেজন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই আমার মহামন্ত্রী। কিন্তু পারছি কই? (হঠাৎ রাণীর মুখোমুখী হইয়া) তৃষার মৃত্যু বিধান করেছ তুমি রাণী।

রাণী ॥ তাকে আমি মুক্তি দিয়েছি রাজা।

রাজা ॥ মুক্তি দিয়েছ! তবে আমিও আজ মুক্ত।

রাণী ॥ মুক্ত! বন্দী তুমি ছিলে নাকি কখনো?

রাজা ॥ ছিলাম না! গুপ্ত কামনা গুপ্ত বাসনা বন্দী করে রাখিনি কি মনের কারাগারে? বিদ্রোহী সেই কামনা বাসনার সঙ্গে করিনি কি অন্তর্যুদ্ধ? বন্দী করে রাখিনি কি নগ্ন সত্যকে? কিন্তু আজ আমি মুক্ত। আর সে মুক্তির প্রথম ঘোষণা তোমাকে হত্যা করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। হত্যা করব আমি তোমাকে।

মহামন্ত্রী ॥ সাবধান রাজা। এ অনাচার আমরা সইব না। এ কি ব্যাভিচার।

রাজা ॥ কার মুখে শুনছি আমি এ কথা! মন্ত্রী! তুমি! পুনরায় অসহ্য যন্ত্রণায়) অনাচার! ব্যাভিচার! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মহামন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করতে কে তাকে বিষ প্রয়োগে করেছিল গুপ্ত হত্যা? তুমি নও? কে তার পত্নীকে উপপত্নী করে রেখেছে? তুমি নও?

মহামন্ত্রী ॥ চুপ—চুপ মহারাজ!

রাজা ॥ চুপ করব কি বলছ মন্ত্রী! জনসভায় চেঁচিয়ে একথা না বলা পর্যন্ত আমার যন্ত্রণার অবসান নেই। কী নিদারুণ এই ব্যাধি—রক্ষা কর, তোমরা আমাকে রক্ষা কর।

মহামন্ত্রী ॥ আপনি হতাশ হবেন না মহারাজ। রাজবৈদ্য আপনার জন্য অব্যর্থ ঔষধ প্রস্তুত করেছেন। একমাত্রা সেবনেই—

রাজবৈদ্য ॥ আপনার যন্ত্রণা দূর হবে মহারাজ। নিদ্রাভিভূত হয়ে শান্তি লাভ করবেন আপনি।

রাজা ॥ আঃ ওঃ [রাজার চোখে মুখে যন্ত্রনার চরম অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হইল।]

রাণী ॥ রাজবৈদ্য, সত্যই কি এমন কোন ঔষধ আছে আপনার?

রাজা ॥ কে ঐ বীভৎসা নারী? কে ঐ রাক্ষসী?

রাণী ॥ মহারাজ। আমি। আমি।

রাজা ॥ তুমি! তৃষাকে না পাওয়ার দুঃখ দূর করব আমি তোমারি রক্ত পানে—

মহামন্ত্রী ॥ ছিঃ মহারাজ! এ অনাচার শোভা পায় না আপনার!

রাজা ॥ সত্য, অতি সত্য, কিন্তু মনের সত্যটাকে গোপন করতে পারছি না আমি। যেমন গোপন রাখতে পারছি না তোমার আমার শত কুকীর্তি। (পুনরায় অসহ্য যন্ত্রণায়) কে কোথায় আছ, শোনো—বিদ্রোহী প্রজাশক্তিকে দমন করতে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিলাম আমি আর এই মন্ত্রী—যে দুর্ভিক্ষে প্রাণ গেছে শত শত প্রজার।

মহামন্ত্রী ॥ মহারাজ, দোহাই আপনার, থামুন। রাজ্যের অমঙ্গল হবে ওতে।

রাজা ॥ কিন্তু তবে আমার যন্ত্রণা যাবে কিসে?

মহামন্ত্রী ॥ রাজবৈদ্যের ঐ ঔষধে।

রাজা ॥ সত্য?

রাজবৈদ্য ॥ সত্য।

রাজা ॥ যদি যন্ত্রণা দূর না হয়, আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব রাজবৈদ্য। দাও।

[রাজবৈদ্য একমাত্রা ঔষধ দিতেই তৎক্ষণাৎ তাহা সেবন করিলেন। মৃত্যুর প্রশান্তি রাজাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। রাজা ভূপতিত হইতে ছিলেন, রাণী তাঁহার দেহ ক্রোড়ে ধরিলেন। মহামন্ত্রী ও রাজবৈদ্য পরস্পর ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিয়া সেখানে আর অপেক্ষা করিলেন না, রাণীকে আশ্বাস দিয়া নিঃশব্দে পলায়ন করিলেন।]

রাণী ॥ রাজা! আমার রাজা! তোমার রাজ সম্মান রক্ষা পেয়েছে। এইবার ঘুমোও রাজা, ঘুমোও। শুধু তোমার সম্মান রক্ষা হয়নি প্রিয়তম, তোমার রাণীর সামাজিক প্রতিষ্ঠাও রক্ষা পেয়েছে। এইবার আমি নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্ত। শ্রান্ত-ক্লান্ত আমার অশান্ত রাজা, ঘুমোও। তোমার অধরে এখনো লেগে রয়েছে সুখ-নিদ্রার পরম ঔষধ। ঐ অমৃত লেহন করে আমিও এখনি ঘুমিয়ে পড়ব তোমার বুকে। আঃ! আজ কতদিন তোমার চুম্বন পাইনি। নিশ্চিন্ত মনে তোমার ঐ অমৃত অধরে একটি চুম্বন এঁকে দেব আমি আজ।…কে আছ, আলো নিভিয়ে দাও। আলো নিভিয়ে দাও।

[কক্ষ অন্ধকার হইয়া গেল। যবনিকা নামিল]

—

মুখোশ

[শ্রীমতী প্রতিমা চৌধুরীর সৌধ-ভবনের উপবেশন কক্ষ। প্রতিমা চৌধুরীর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। এখনও চেহারা দেখিলে মনে হয় নামটি মিথ্যা ছিল না। বর্ত্তমান কাল। সন্ধ্যা রাত্রি। একটি গোল টেবিল ঘিরিয়া কয়েকজন গণ্যমান্য চেহারার লোক উপবিষ্ট। প্রতিমার এক পার্শ্বে একটি সুদর্শন তরুণ, নাম 'আনন্দ'। অন্যপাশে নথিপত্র লইয়া ব্যস্ত একজন প্রৌঢ় উকিল। আশে-পাশে প্রতিমার প্রিয় কর্ম্মচারীগণ।]

প্রতিমা॥ আপনারা সবাই আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন, দয়া ক'রে এসেছেন —এটা আমার ভাগ্যের কথা। আপনাদের এর আগেও জানিয়েছি, আজও বলছি, আমি কলকাতা ছেড়ে জন্মের মত চ'লে যাচ্ছি। চলে যাচ্ছি আমার গুরুদেবের শ্রীচরণে পড়ে থেকে বাকিজীবনটা কাটাতে। তিনি থাকেন বৃন্দাবন। এখানে আমি শান্তি পাচ্ছিলাম না, রাত্রে ঘুম হয় না, শরীর ভেঙে পড়েছে। ব্লাডপ্রেসার এত বেশী যে, যখন তখন নাকি আমার মৃত্যু হতে পারে ডাক্তার বলে। সব কথা গুরুদেবকে জানিয়েছিলাম, তাতেই তিনি লিখেছেন, কি কাজ অশান্তির মধ্যে থেকে, ওখানকার সব মায়া কাটিয়ে চলে এসো বৃন্দাবনচন্দ্রের পায়ে, শান্তিতে থাকবে এখানে। তাঁর আদেশ শিরোধার্য্য করেছি আমি। এই দেখুন, এই কটা কথা বলতে আমি কেমন হাঁপিয়ে পড়েছি।

অনেকে॥ না, না, আপনি বসুন। আপনি আর কথা বলবেন না।

প্রতিমা॥ কিন্তু কথা না বললেও তো চলছে না! আপনাদের কিছু বলব, কিছু শোনাবো বলেই ডেকে এনেছি আমি।

উকিল॥ আপনার যেটা বলার, সেটা না হয় আমিই বল'ছি।

প্রতিমা॥ না, না। যা বলবো এ আমার শেষ কথা। এ বলতেই হবে আমাকে। শুনুন! আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার আগে, একটা উইল করে যাচ্ছি! সেই উইলে কাকে কি দিয়ে গেলাম এইবার সেটা বলছি।

স্বামীজী॥ আমি ব্রহ্মচর্য সাধনাশ্রমের প্রতিনিধি রূপে আজ এখানে এসেছি। আপনি আমাদের সাধনাশ্রমে দশহাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা উইলে করেছেন, এটা জানিয়েছেন। আমি আপনাকে আজ জানাতে এসেছি যে, আপনার ঐ দান গ্রহণ করতে আমরা অসমর্থ।

প্রতিমা॥ কেন? আপনারা এক পত্র দিয়ে জানিয়েছিলেন, এ দান আপনারা সানন্দে গ্রহণ করবেন!

স্বামীজী॥ সেটা ছিল আমাদের আশ্রম-অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত মত। আশ্রমের কার্যনির্বাহক সভায় এ নিয়ে তুমুল মতদ্বৈধ দেখা যায়। কাল রাত্রে এ সম্পর্কে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, আমি সেই সিদ্ধান্তই আপনাকে জ্ঞাপন করতে এসেছি। এই নিন আমাদের সভাপতির স্বাক্ষরিত পত্র।

উকিল॥ আমাকে দিন। (পত্রটি গ্রহণ করিলেন।)

প্রতিমা॥ কি অপরাধে আপনারা আমাকে এ দণ্ড দিলেন?

স্বামীজী॥ এ টাকা পাপের টাকা। ব্যাভিচার-অর্জিত টাকা আর যে-ই গ্রহণ করুক, ব্রহ্মচর্য আশ্রম গ্রহণ করতে পারে না।

অনেকে॥ না, না। এ সব কথা আপনি কি বলছেন? আপনার কি সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞানটুকুও নেই? ছিঃ!

স্বামীজী॥ আমি আমার আশ্রমের বক্তব্যকেই পেশ করে গেলাম। নমস্কার!

(স্বামীজীর প্রস্থান)

উকিল॥ কথাটা একটা চিঠি দিয়েই জানানো যেতো। (প্রতিমাকে) আপনি কি এখনও ঐ দশহাজার টাকা ওঁদের নামে উইলে রেখে দেবেন?

প্রতিমা॥ ওঁরা না নেন, অন্য কোন আশ্রমের নাম ওখানে বসিয়ে দিলেই চলবে। আমি বুঝেছি, এ আক্রোশের কারণ কি?

অনেকে॥ কী?

প্রতিমা॥ আমার এই আনন্দ। ও ছিল ওঁদের ঐ আশ্রমের সবচেয়ে ভালো কর্মী। একবার ওঁদের ঐ আশ্রমের দুর্গাপূজো হচ্ছিল, প্রতিমা দেখতে গিয়ে দেখি, আনন্দ করছে আরতি। সেই আনন্দকে ওখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি এখানে, আমার বুকে।

কেউ কেউ॥ ব্যাপারটা এখন বোঝা যাচ্ছে।

প্রতিমা॥ ঐটুকু ছেলেকে ব্রহ্মচর্যের সাধনায় দীক্ষিত করে জীবনের আর মনের সব জানালা-দরজা বন্ধ করে দেওয়াকেই বরং আমি মনে করেছিলাম

বর্তমান কালের একটা নিষ্ঠুর অসামাজিক প্রথা। ও ছিল অনাথ। বাপ-মা, এমন কি কোনো অভিভাবক চোখে দেখে নি ও কখনও !

আনন্দ ॥ শুনেছি, ডাস্টবিন থেকে আমাকে কুড়িয়ে নিয়েছিলেন ওঁরা !

প্রতিমা ॥ তাতে কিছু আসে যায় না। আস্তাকুঁড়েও ফুল ফোটে; তাতে ফুলের জাত যায় না। তাই ও সাবালক হতেই ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছিলাম আমার কাছে। ওকে লেখা পড়া শিখিয়েছি—সব রকম সমাজে মেশবার সুযোগ করে দিয়েছি; ভালোমন্দ সব কিছু ও নিজের চোখে দেখেছে, শিখেছে। (হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন) আমি যে পতিতা নারী, সেটা আমি অস্বীকার করছি না। সমাজের কোন্ কোন্ রথী মহারথী আমার এখানে টাকা ঢেলে, আমাকে এত বড় করেছেন আমি মারা গেলে, সে সব নাম আপনারা খুঁজে পাবেন আমার চিঠিপত্রে।

আনন্দ ॥ মাসী ! তুমি চুপ করো, শান্ত হও। চলো, ঘরে চলো, একটু বিশ্রাম করবে চলো।

উকিল ॥ হ্যাঁ, তাই নিয়ে যাও আনন্দ, এখানকার কাজ আমিই চালিয়ে নিচ্ছি।

[আনন্দের ইঙ্গিতে ভৃত্য বনমালী এবং খাস দাসী মোক্ষদা কম্পিত-দেহা প্রতিমা চৌধুরীকে ঘরে লইয়া গেল।]

স্কুল সেক্রেটারী ॥ প্রতিমা দেবী আমাকে জানিয়েছিলেন আমাদের স্কুলেও কিছু দান করবেন।

আনন্দ ॥ হ্যাঁ, করবেন। উইলে আপনাদের নাম উঠেছে।

উকিল ॥ আপনাদের স্কুলে উনি দশ হাজার টাকা দিয়েছেন।

স্কুল সেক্রেটারী ॥ দাতা শতায়ু হোন। আমাদের স্কুলে যে দশা, যে দুর্দশা চলছে, তাতে প্রতিমাদেবীর এই মহৎ দান—যাকে বলে 'গড্স্ সেণ্ট' মানে ঈশ্বর প্রেরিত। ওঁর ঐ কৃপাদৃষ্টির জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আনন্দ ॥ কিন্তু এটাও কৃপাদৃষ্টি কি শিলাবৃষ্টি সেটা আপনারা বিবেচনা করে দেখবেন। কারণ, আপনাদের ঐ স্কুলেই আমাকে মাসী প্রথম ভর্তি করান। পরে যখন জানাজানি হয় যে, উনি আমার মাসী, আর আমারও নেই কোন পিতৃ পরিচয়, তখন সারা স্কুলে আমাকে নিয়ে কুৎসার গুঞ্জন সুরু হলো। ছাত্রদের অভিভাবকরা প্রতিবাদ সুরু করে দিলেন, যার ফলে আপনাদের ঐ স্কুল থেকে আমি হলাম বিতাড়িত। সেই স্কুলে এই দান বিশেষ তাৎপর্য-

পূর্ণ সন্দেহ নেই।

একজন ॥ তার মানে, প্রতিমাদেবী চাঁদির জুতো মেরেছেন আপনাদের, স্যার!

উকিল ॥ দানের এই প্রস্তাব আপনাদের পূর্বেই জানানো হয়েছিল। এ দান গ্রহণে তাহ'লে আপনাদের কোনো আপত্তি নেই?

স্কুল সেক্রেটারী ॥ আপত্তি কি বলছেন মশাই, এই বর্ষায় স্কুলের ছাদ দিয়ে যে জল পড়ছে, সেটা না ঠেকাতে পারলেই বিপত্তি।

আনন্দ ॥ সাধু! সাধু!

উকিল ॥ এর পরের দানগুলি সবই ব্যক্তিগত দান। যেমন বহুকালের বিশ্বস্ত ভৃত্য বনমালী—পাঁচ হাজার টাকা। বহুকালের বিশ্বস্ত দাসী মোক্ষদা—পাঁচ হাজার—

মোক্ষদা ॥ হ্যাঁগা, এ কেমনটি হল। মুড়ি মিছরির একদর।

আনন্দ ॥ চুপ।

উকিল ॥ বাজার সরকার মশাই, তিন হাজার টাকা—

বাজার সরকার ॥ মাত্র তিনহাজার পেলাম!

আনন্দ ॥ অনেক তিনহাজার তো এর আগেই পেয়ে গেছেন!

বাজার সরকার ॥ সবাই তাই বলে বটে, এটা বলা লোকের স্বভাব। কিন্তু আমি কি পেয়েছি না পেয়েছি, সেটা জানেন ধর্ম!

আনন্দ ॥ থামুন!

উকিল ॥ নার্স তরঙ্গিণী হাজরা, দু' হাজার। কোথায় তিনি?

আনন্দ ॥ মাসীর ঘরে ডিউটি দিচ্ছেন।

উকিল ॥ ড্রাইভার পশুপতি দাস—বহুবার প্রাণের ভয় না করে ট্রেন ধরিয়ে দিয়েছে। আর গাড়ি চালাতে গিয়ে একটিবারও অ্যাকসিডেন্ট করেনি। দু' হাজার।

[ডাক্তারের প্রবেশ]

উকিল ॥ এই যে ডাক্তারবাবু এসে গেছেন।

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, শুনলাম হরির লুট হচ্ছে।

উকিল ॥ দুঃখ নেই, এক কিলো বাতাসা আপনিও পেয়ে গেছেন। প্রতিমাদেবী উইল করে গৃহচিকিৎসক আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন।

ডাক্তার ॥ আমি জানি। সত্যিই ওঁর দয়ার অন্ত নেই। কোথায়, ভেতরে? আমি দেখে আসছি।

[ডাক্তারের অন্দরে প্রস্থান]

উকিল। এইবার প্রতিমা দেবী দয়া করে আমাকে কি দিয়েছেন, আপনারা শুনুন। এতকাল ওঁর বৈষয়িক স্বার্থরক্ষা আমি করে এসেছি বলে—আমাকে দিয়েছেন দশহাজার। এবং উইলে একটি সর্ত রেখেছেন—যদি কোন লোক বা প্রতিষ্ঠান উইলোক্ত দান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রহণ না করে, তবে সে টাকাটাও পাবো আমি।

কয়েকজন ব্রহ্মচর্য আশ্রমের টাকাটা তাহলে আপনার কপালেই নাচছে দেখছি।

আনন্দ। আপনারা উতলা হবেন না। ঐ দেখুন, ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সেক্রেটারী মশায় এসে উপস্থিত। আমি প্রতিমুহূর্তে ওঁর শুভাগমন প্রতীক্ষা করছিলাম।

[ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সেক্রেটারীর প্রবেশ]

আশ্রম সেক্রেটারী।। এই যে আনন্দ। ভালো আছ তো?

আনন্দ।। হাঁ, স্যার, বসুন।

আশ্রম সেক্রেটারী। মা জননী কোথায়?

আনন্দ।। জানেনই তো অসুস্থ।

আশ্রম সেক্রেটারী।। বৃন্দাবন চলে যাচ্ছেন উইল করে সব দিয়ে থুয়ে, তাও জানি। রোজই ভাবি একবার এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাবো—তা আমারও সেই হাঁপানির টান। সাহস পাইনা। কিন্তু আজ না এসে পারলাম না। আমাদের কার্যনির্বাহক সমিতির একটি বিশেষ জরুরি মিটিং এইমাত্র আমি সেরে এলাম। পূর্বের সিদ্ধান্ত নাকচ করে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, টাকার গায়ে পাপ-পুণ্য কিছু লেখা থাকে না। ও দশহাজার টাকা ব্রহ্মচর্যাশ্রম নেবে—এই যে আমাদের নতুন সিদ্ধান্তপত্র।

উকিল।। ওটা আমাকে দিন, আমি দেখছি।

[তিনি পত্রটি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন]

আশ্রম সেক্রেটারী।। আসল কথা কি জানো বাবা আনন্দ, মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্যই হল গিয়ে গোবরে পদ্ম ফুল ফোটানো। যা আমরা করছি—সে ফুলের একটি হচ্ছ তুমি!

উকিল।। বেশ! তাহলে ব্রহ্মচর্য আশ্রমও দশহাজার টাকা পাচ্ছে।

স্কুল সেক্রেটারী।। হ্যাঁ! আপনি সেটা পাচ্ছেন না। আচ্ছা, আনন্দ, তুমি কি পেলে?

উকিল ॥ উনি সবই পেতে পারতেন। ষোল আনাই পাওয়ার কথা ছিল ওঁর কিন্তু এক পয়সাও নেন নি উনি, নিতে রাজী হন নি উনি।

আশ্রম সেক্রেটারী ॥ এটা কি রকম হলো, আনন্দ? আমি তো এতে নিরানন্দ হচ্ছি, বাবা!

আনন্দ ॥ না স্যার! নিরানন্দ হবার কিছু নেই। আমাকে উনি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলেছেন, নিজের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা দিয়েছেন। আমাকে সব সময়ই বলে এসেছেন, 'আনন্দ আমি মারা গেলে, আমার কোনো টাকা তুমি ছুঁয়ো না। তাতে তোমার কল্যাণ হবে না, বাবা'

আশ্রম সেক্রেটারী ॥ হ্যাঁ? কথাগুলো যেন কেমন হেঁয়ালীর মত শোনাচ্ছে!

[ডাক্তারের প্রবেশ]

ডাক্তার ॥ আনন্দ! তোমার মাসীর প্রেসারটা খুবই বেড়ে গেছে। এতটা বেড়েছে যে প্রতিমুহূর্তে ভয়ের কথা। উইলে যদি ওঁর সই করা বাকি থাকে তো, এখুনি করিয়ে নিন। এর পরে হয়তো আর সময় নাও পেতে পারেন।

উকিল ॥ না, উইলে উনি আজ সকালেই সই করেছেন। উইলের এক্সিকিউটার করেছেন আমাকে, এখন যেটুকু করণীয়, সে আমি নিজেই করে নিতে পারবো

[সকলকে চমকিত করিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন প্রতিমা চৌধুরী]

প্রতিমা ॥ না, না এ উইল নয়। এ উইল আমি বদলাবো।

অনেকে। সর্বনাশ!

প্রতিমা ॥ সর্বনাশ, আবার কি? আমি ভেবে দেখলাম পাপের টাকা পাপেই থাটুক। পাপী-ই থাক।

উকিল ॥ কি বলছেন, আপনি?

প্রতিমা ॥ ঠিকই বলছি। লেখো উকিল, আমি আমার সব সম্পত্তি দান করছি আমার মত যারা সত্যিকারের পতিতা, তাদের। পঞ্চাশের পর তাদের দেখাশোনা করার কেউ থাকে না। টাকাটা আমি সরকারের হাতে দিয়ে যাচ্ছি—তাদেরই ভরণপোষণের জন্যে।

অনেকে ॥ কিন্তু শুনুন! একটা কথা বিবেচনা করুন মা! দয়া করে বুঝে দেখুন!

প্রতিমা ॥ (চীৎকার করিয়া) আমি ঢের বুঝেছি—আ—!

[একটি স্ট্রোক। ডাক্তার ছুটিয়া গিয়া ধরিলেন। আনন্দের সাহায্যে

তাহাকে ধরাধরি করিয়া অন্দরে লইয়া যাওয়া হইল।]

একজন ॥ উনি কি সেরে উঠতে পারেন?

উকিল ॥ বলা যায় না।

অন্য একজন ॥ ঈশ্বরের দেখা উচিত।

স্কুল সেক্রেটারী ॥ ঈশ্বর কি দেখবেন?

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সেক্রেটারী ॥ ওঁকে, না আমাদের?

[অন্দর হইতে ডাক্তারের প্রবেশ]

ডাক্তার ॥ সব শেষ। এই মাত্র প্রতিমা দেবীর মৃত্যু হলো।

প্রায় সকলে একসঙ্গে ॥ (স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে) যাক। বাঁচা গেল।

উকিল ॥ ভাল করে নাড়ীটা দেখেছেন তো? বেঁচে ওঠার কোনো সম্ভাবনাই কি আর নেই?

ডাক্তার ॥ না। আপনাদের উইলটা রক্ষে পেল।

স্কুল সেক্রেটারী ॥ জয় হরি, জয় হরি।

আশ্রম সেক্রেটারী ॥ জয় গুরু, জয় গুরু।

ডাক্তার ॥ আঃ কি হচ্ছে? এটা আনন্দের সময় নয়।

[আনন্দের প্রবেশ। সকলে বুঝিল, কথাটা ঠিক; আনন্দটা নিতান্তই বেমানান হইয়াছে। সকলেই সংযত এবং চেষ্টা করিয়া বিষাদাচ্ছন্ন হইল।]

উকিল ॥ (ভারী গলায়) সত্যি! আজ আমাদের কি দুর্দিন!

আশ্রম সেক্রেটারী ॥ কত বড় একজন মহাপ্রাণ মহিলা আমাদের অনাথ করে স্বর্গে চলে গেছেন।

স্কুল সেক্রেটারী ॥ তাঁর অমর আত্মার সদ্গতি হোক।

আনন্দ ॥ সে জন্যে আপনাদের ভাবতে হবে না। এখন ওঁর সৎকারের ব্যবস্থা করতে হয়। দয়া করে আপনারা কেউ চলে যাবেন না।

সকলে ॥ এ তোমাকে বলতে হবে কেন, বাবা? আমরা সানন্দে তোমাকে সাহায্য করছি। সানন্দে।

॥ যবনিকা ॥

সত্যমেব জয়তে

[কুম্ভমেলার শেষদিবস। 'ওঁ তৎসৎ' আশ্রমের সাধনচক্র। সাধন বেদীতে আচার্য. সম্মুখে পঞ্চ সাধু। সন্ধ্যারাত্রি।]

আচার্য ॥ ওঁ বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা—

সাধুগণ ॥ আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক।

আচার্য ॥ মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম—

সাধুগণ ॥ আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক।

আচার্য ॥ আবিরাবির্ম এধি।

সাধুগণ ॥ হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

আচায ॥ ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি।

সাধুগণ ॥ আমি মানসিক সত্য বলিব, বাচনিক সত্য বলিব।

আচায ॥ সত্যমেব জয়তে!

সাধুগণ ॥ সত্যের জয় হউক।

আচার্য ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধুগণ ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আচায ॥ ওঁ তৎসৎ।

সাধুগণ ॥ ওঁ তৎসৎ।

আচার্য ॥ কুম্ভমেলার এই শেষ দিনটিতে ওঁ তৎসৎ আশ্রমমার্গী আমাদের শেষ কাজ এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষটিকে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ।

সাধুগণ ॥ সাধু! সাধু! সাধু!

প্রথম সাধু ॥ এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষটি কে?

দ্বিতীয় সাধু ॥ শুধু অভিনন্দন এবং আশীর্বাদেই কি শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষটির উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন হবে আচার্যদেব?

আচার্য ॥ আমরা ভ্রাম্যমান সাধু। ধনসম্পদ আমরা আবর্জনা মনে করি। সত্যই আমাদের একমাত্র ধর্ম, সদিচ্ছা শুভেচ্ছাই আমাদের একমাত্র ঐশ্বর্য। এ বিশ্বাস আমার আছে, ওঁ তৎসৎ আশ্রমমার্গী আমাদের অভিনন্দন এবং আশীর্বাদ প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করবেন এবৎসরের শ্রেষ্ঠ সৎ লোকটি।

সাধুগণ ॥ সাধু! সাধু! সাধু!

প্রথম সাধু ॥ তিনি কে?

দ্বিতীয় সাধু ॥ তিনি কোথায়?

তৃতীয় সাধু ॥ তাঁকে দর্শন করবার জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে রয়েছি আচার্য।

চতুর্থ সাধু ॥ এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ সৎলোকটি কি ভাবে নির্বাচিত হয়েছেন তা জানতেও কৌতূহলের অন্ত নাই আচার্য।

পঞ্চম সাধু ॥ [চতুর্থ সাধুকে] আপনি কি বিস্মৃত হয়েছেন, যে গতবৎসর কুম্ভমেলা কালে 'ওঁ তৎসৎ' আশ্রমমার্গী আমরা সর্বসম্মতিক্রমেই আমাদের আচার্য দেবকে এই নির্বাচনের গুরুভার অর্পণ করেছিলাম।

প্রথম সাধু ॥ স্থির হয়েছিল মহামান্য আচার্য স্বীয় যোগবলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নির্বাচন করবেন বৎসরের শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষটি।

আচার্য ॥ সেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করেছি সাধুগণ।

চতুর্থ সাধু ॥ আমার বিস্মৃতির জন্য আমি অনুতপ্ত আচার্য।

পঞ্চম সাধু ॥ কিন্তু আর বিলম্ব নয় আচার্য। আমরা সেই মহাপুরুষের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে পড়েছি।

আচার্য ॥ তাঁকে আমি স্মরণ করা মাত্র তিনি আপনাদের সমক্ষে আবির্ভূত হয়ে আমাদের আনন্দ বিধান করবেন।

সাধুগণ ॥ সাধু! সাধু!

প্রথম সাধু ॥ অলম বিলম্বেন।

দ্বিতীয় সাধু ॥ তাঁকে স্মরণ করুন, স্মরণ করুন আচার্য।

আচার্য ॥ পাপ এবং অনাচার অধ্যুষিত এই জগতে, মিথ্যাচার পরিপুষ্ট এই লোক সমাজে, এই ঘোর কলিকালে আমরা তোমার দর্শন কামনা করি হে শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষ! আমরা বিশ্বাস করি তোমার মতো সত্যাশ্রয়ী মহাপুরুষের আবির্ভাবে আবার সূচিত হবে সত্যের জয়যাত্রা। বৎসরের শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষ, তুমি আবির্ভূত হও, আবির্ভূত হও। অন্ধকার জগত সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হোক্, সত্যের জয় হোক্! ওঁ তৎসৎ!

সাধুগণ ॥ ওঁ তৎ সৎ! ওঁ তৎ সৎ! ওঁ তৎ সৎ!

[সাধুগণ ধ্যানস্থ হইলেন। সেখানে আবির্ভূত হইল একটি গুণ্ডা। মূর্তিমান এক শয়তান]

আচার্য বাদে অন্যান্য সাধুগণ ॥ একি! স্বয়ং শয়তান!

[শয়তান মৃদু হাস্য করিয়া আভূমি নত হইয়া সকলকে নমস্কার করিল]

প্রথম সাধু ॥ আমরা কি স্বপ্ন দেখছি!

দ্বিতীয় সাধু। আচার্যদেব কি আমাদের সঙ্গে পরিহাস করছেন?

তৃতীয় সাধু ॥ আমরা অপমানিত বোধ করছি।

চতুর্থ সাধু ॥ মূর্তিমান শয়তানকে দর্শন করে আমরা অশুচিবোধ করছি।

পঞ্চম সাধু ॥ আচার্যদেব যত মহামানুষই হোন, আমাদের সঙ্গে এই মর্মান্তিক পরিহাস করার জন্য, আমাদের এইভাবে অপমান করার জন্য, আমরা তাঁকে অভিযুক্ত করছি।

আচার্য ॥ ধর্মভ্রাতৃগণ! আপনারা উত্তেজনা প্রশমন করুন, শান্ত হোন শান্ত হোন। আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন।

সাধুগণ ॥ বলুন।

আচার্য ॥ ধর্মভ্রাতৃগণ, সত্যের পূজারীগণ! যোগবলে, আশাকরি আমার যোগবল সম্বন্ধে আপনারা কোন সন্দেহ পোষণ করেন না—

সাধুগণ ॥ না, তা করি না, কিন্তু—

আচার্য ॥ আপনারা অনুগ্রহ পূর্বক ধৈর্য ধরুন, শুনুন! যোগবলে, পূর্ণ একটি বৎসর লোকচরিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে আমি এই সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে আজকার জগতে এই মূর্তিমান শয়তানই সর্বশ্রেষ্ঠ সৎলোক

সাধুগণ ॥ ধিক ধিক্ আপনাকে।

আচার্য ॥ আমার যোগশক্তিকে আপনারা অপমান করছেন।

[নিস্তব্ধতা]

আচার্য ॥ আমি পুনরায় ঘোষণা করছি, যোগশক্তি প্রভাবে উপযুক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই আমি এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে বর্তমান সমাজে এই শয়তানই একমাত্র সৎলোক। কারণ একমাত্র এই লোকটিরই কর্ম এর চিন্তাকে অনুসরণ করেছে। একমাত্র এই লোকটিরই কার্যাবলী ও বাক্যাবলী আমি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছি—যা অন্য কোন লোককে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও পারিনি। একে আমি বুঝতে পেরেছি, চিনতে পেরেছি, জানতে পেরেছি, যা অন্য কাউকে যোগবলেও পারিনি। এই শয়তান মনে যা ভেবেছে মুখে হয়তো তা বলেনি, কিন্তু কাজে তা করেছে।

[শয়তান সস্মিত মুখে আভূমি নত হইয়া সকলকে নমস্কার করিল]

আচার্য ॥ কিন্তু অন্য সব লোক সম্পর্কে আজ আর একথা বলা চলে না। তারা মনে ভাবে এক, মুখে বলে আর এক, কাজে করে অন্য কিছু। তাদের মন মুখ ও কাজের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকে না আজ।

প্রথম সাধু ॥ একথা কিন্তু অত্যন্ত সত্য।

দ্বিতীয় সাধু ॥ তা বটে। যেমন বিশ্ব শান্তি! সবার মুখে আজ শান্তির বাণী. কিন্তু,—

তৃতীয় সাধু ॥ কিন্তু তাদের মনের কথা কি তাই?

চতুর্থ সাধু ॥ তাদের কাজে কি তাই প্রমাণ হচ্ছে?

পঞ্চম সাধু ॥ মোটেই না। এই ধরুন, 'উন্নতি' আর 'উন্নয়ন' এই দুইটি শব্দ, কার মুখে না শুনছি আজ?

প্রথম সাধু ॥ কিন্তু মানুষের দুঃখ কষ্ট শেষ হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি? বরং দেখা যাচ্ছে ধনী হচ্ছে আরো ধনী, দরিদ্র হচ্ছে আরো দরিদ্র।

আচার্য ॥ অলমিতি বিস্তারণে·· ···কিন্তু এমন ধাপ্পা শয়তান দেয় না। মুখে তার শান্তির বাণী নেই। কারো উন্নতি বা উন্নয়নের কথা সে বলেও না চিন্তাও করে না। অপরের সর্বনাশই সে চিন্তা করছে। অপরের সর্বনাশই সে করছে। তাকে বুঝতে পারি আমরা। তার চিন্তা ও কার্যের সামঞ্জস্য ও সততা সন্দেহাতীত। কাজেই, আমার বিচারে শয়তানই আজ সত্যাশ্রয়ী এবং নিঃসন্দেহে সৎ-শ্রেষ্ঠ।

সাধুগণ ॥ সাধু! সাধু! সাধু!

[শয়তান আভূমি নত হইয়া সকলকে নমস্কার করিল।]

সাধুগণ ॥ সত্যমেব জয়তে!

শয়তান ॥ সত্যমেব জয়তে!

[শয়তান এবার সানন্দে সাধুগণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল।]

সাধুগণ ॥ ওঁ তৎসৎ! ওঁ তৎসৎ! ওঁ তৎসৎ!

(সাধুগণ উত্তোলিত হস্তে শয়তানকে আশীর্বাদ করিলেন!)

॥ যবনিকা ॥

বীক্ষণ

[সুবিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ্ ডক্টর মানস চৌধুরীর মনো-বিজ্ঞান-মন্দির। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত প্রদর্শনী কক্ষ। ডক্টর চৌধুরী এবং তাঁহার বন্ধু তাপস রায়ের মধ্যে ডক্টর চৌধুরী কর্তৃক সদ্য-আবিষ্কৃত 'বীক্ষণ' নামক যন্ত্র সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হইতেছে। সন্ধ্যা রাত্রি]

মানস ॥ তারপর ?

তাপস ॥ 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড'-এর খবরটা দেখেই আনন্দে আমি লাফিয়ে উঠলাম মানস। 'বিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এম, চৌধুরীর চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার! মনোরাজ্যের গুপ্তরহস্য প্রকাশক বিস্ময়কর যন্ত্র 'বীক্ষণ'! মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম রহস্য উদ্ঘাটন! বিংশ শতাব্দীর নবতম বিস্ময়!' দেশে ফিরেই তাই কাগজগুলো নিয়ে ছুটে এলাম তোর কাছে। দেখ—

মানস ॥ দেখেছি। দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় ঐ সবই লিখছে। জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদেরও অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন। নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, মস্কো—এমন কি টোকিও থেকেও এসেছে বহু নিমন্ত্রণ। শুধু তেমন সাড়া পাচ্ছি না নয়া দিল্লীর।

তাপস ॥ এতে কিন্তু আমি এতটুকুও বিস্মিত হচ্ছি না মানস। 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না' যে দেশে, সেটা আমাদের দেশ। রবীন্দ্রনাথের কথা জানিস তো! নোবেল প্রাইজ পেলেন; তখন এদেশে শুরু হলো তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ি। ঘাবড়িয়ো না বন্ধু, তোমার ক্ষেত্রেও তাই-ই হবে। তোর এই আবিষ্কারের পেটেন্ট নিয়েছিস তো ?

মানস ॥ হ্যাঁ, তা নিয়েছি।

তাপস ॥ যন্ত্রটির নামটি কিন্তু ভারি সুন্দর দিয়েছিস—'বীক্ষণ'। ইংরেজি নাম দিলে এত খুশি হতাম না মানস। 'বীক্ষণ' নামটি খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েটও হয়েছে। 'বীক্ষণ' কিনা বিশেষভাবে দর্শন!

মানস ॥ 'অণুবীক্ষণ' কথাটি আমাদের দেশে চালু আছে। তাই ভাবলাম, 'বীক্ষণ' নামটা চলবে। আয় তাপস, তোকে একবার বীক্ষণ করি। আয়

'বীক্ষ্যমাণের' এই চেয়ারটায় এসে বোস্। এই 'হস্ত অধিষ্ঠান চক্রে' হাতটা রাখ। হাত রাখলেই যন্ত্রটা চালিয়ে দেব আমি। সঙ্গে সঙ্গে তোর মনের গুপ্ততম কথাও প্রকাশ করতে বাধ্য হবি। সাধ্য হবে না তোর তা গোপন রাখতে।

তাপস ॥ ওরে বাবা বলিস কি?

মানস ॥ হ্যাঁ। এক মাস আগে তুই কি চিন্তা করেছিস তা' তোর মন থেকে টেনে বের করে তোর নিজ মুখে বলিয়ে নিতে পারব আমি, শুধু এই বৃত্তটাকে ঘুরিয়ে এক মাসের অনুপাতে পিছিয়ে দিয়ে এমনি ক'রে এক বছর আগেকার মনের চিন্তাধারাও টেনে বের করা যায় তোরই মুখ থেকে। পরিত্রাণ নেই বন্ধু, আজ আমার হাতে তোমার…। ডুবে ডুবে জল খাওয়া আর এখন চলবে না বন্ধু কারো।

তাপস ॥ কী সবনেশে লোক তুই! মানুষ খুন করতে পারিস দেখছি তুই! কাকে নিয়ে এসব পরীক্ষা তুই করেছিস এত দিন?

মানস ॥ নিজকে দিয়েই শুরু করেছিলাম।…বহুকাল থেকে ডায়ারী লিখি আমি। প্রতিজ্ঞা করে বসতাম নিজের কথা মুখে আমি বলব না, কলমে আমি লিখব না। ডায়ারীর পাতাতেই তা থাক্ সুগুপ্ত। 'হস্ত-অধিষ্ঠান চক্রে' বাঁ' হাত রেখে ডান হাতে কলম নিয়ে এই চেয়ারে বসতাম। সহকারী ছেলেটি পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী চালিয়ে দিত এই বীক্ষণ। কিছুতেই রোধ করতে পারিনি সত্যকে। শুধু মুখেই বলিনি, যন্ত্রটির চাপে আমাকে কাগজেও লিখে দিতে হয়েছে মনের গুপ্ততম প্রতিটি চিন্তাকণা। পরে দেখা গেছে ডায়ারীর সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে তা।

তাপস ॥ আমি ভাই পালাচ্ছি।

মানস ॥ না না, তুই পালাবি কেন তাপস? পালিয়েছে আমার সহকারীরা। হ্যাঁ, এক এক করে সবাই পালিয়েছে। কেউ ভয়ে, কেউ লজ্জায়। বিপদ হয়েছে এই, আজ আমার কোনও সহকারী নেই। নতুন বিজ্ঞাপন দিয়ে যাদের পাচ্ছি তাদের প্রথম সর্তই এই যে, তাদের এই যন্ত্রে পরীক্ষা করা চলবে না। তোর কথা স্বতন্ত্র। বাল্যকাল থেকে তুই আর আমি হরিহর আত্মা—কে না জানে!

তাপস ॥ না না ভাই, সেদিন আর নেই। সে ছিল বটে বাল্যকালে। ছিল বটে প্রথম যৌবনে। কিন্তু তোর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে রয়েছিও তো অনেক

দিন। না জানি কত গোপন পাপ জমা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে এই বুকে। রক্ষে কর ভাই। সারা বিশ্বে তোমার জয়জয়কার হোক, আমাকে তুমি তোমার গর্বে গর্বিত করেই সুখী রাখ, যন্ত্রটি দিয়ে পরীক্ষা করে বিব্রত করো না বন্ধু।

মানস ॥ তুই কি ভাবছিস তাপস, তোর গুপ্ত কথা আমি কারও কাছে ব্যক্ত করব! আমাকে তোর এত অবিশ্বাস?

তাপস ॥ না না, তোমাকে অবিশ্বাস করছি না আমি, তোমাকে লজ্জা পাচ্ছি, তাই।

মানস ॥ আমার কাছেও তোর লজ্জা! প্রথম যৌবনে দুই বন্ধুতে যে সব কাণ্ড আমরা করেছি, তা যদি পরস্পরের কাছে লজ্জার না হয়ে থাকে, আজ লজ্জা কেন বন্ধু! না না, আমি তোর কোন কথা শুনব না। এই মুহূর্তে তোর মনের কথা কি, আয়, সেটা জানা যাক্। নিশ্চয়ই আমার সামনে বসে থেকে এমন কোন পাপ-কথা ভাবছিস নে যেটা তোর লজ্জার কারণ হতে পারে। আমি তোকে কথা দিচ্ছি বর্তমান এই মুহূর্তগুলির পেছনে তোকে আমি টেনে নিয়ে যাব না—যাব না। এখন এখানে বসে যা ভাবছিস ঠিক তাই বের করে নেব।

তাপস ॥ সত্যি? সত্যি তো?

মানস ॥ আমি তোকে কথা দিচ্ছি তাপস, কথা দিচ্ছি।

তাপস ॥ বেশ। তবে দেখ। আমার কৌতূহলটাও মিটুক। কিন্তু জেনে রাখ প্রতিজ্ঞা করছি আমি, আমি যাই-ই ভাবি না কেন এখন, গুপ্ত রাখতেই চেষ্টা করব সেটা প্রাণপণে। কোথায় কি করতে হবে বল।

মানস ॥ সাধু! সাধু! আয়।

[মানসের নির্দেশ মত তাপস যথাস্থানে তাঁহার বাম হস্ত রক্ষা করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটি ফাউন্‌টেন পেন দেওয়া হইল এবং সম্মুখে রাখা হইল একটি লিখিবার প্যাড। মানস যন্ত্রাদি যথা নিয়মে চালাইয়া দিলেন। যন্ত্রের নানান জায়গায় লাল নীল বাতি জলিয়া উঠিল। মেশিন চলিবার শব্দ উঠিল। তাপস ধীর, স্থির, গম্ভীর হইয়া গেলেন। মুহূর্তকাল পরেই দেখা গেল যন্ত্রের শব্দকে ডুবাইয়া দিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন এবং কলম দিয়া তাহা প্যাডে স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিতেছেন।]

তাপস ॥ উঃ! শেষ কালে তুই এত বড় একটা আবিষ্কার করে ফেলালি মানস! তোর এই জয়, তোর এই যশ, এ যে আমি কিছুতেই সইতে পারছি না। তুই এত বড় হলি! আর আমি! কে আমাকে চিন্‌ছে? যা দেখছি, তুই কোটিপতি হবি। আর আমি!

[মানসের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। বেদনাহত হইলেন তিনি। মানসের লিখিত কাগজখানি টানিয়া লইয়া তিনি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং মেশিনটি বন্ধ করিয়া দিলেন। গভীর নিস্তব্ধতা। তাপস ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন।]

তাপস ॥ কি বলছিলাম আমি?

মানস ॥ (হাসিয়া) ঐ এক কথা। আমার গর্বে তুই কত গর্বিত তাই। সত্যি, এত ভালোবাসিস তুই আমাকে!

তাপস ॥ দেখি, কি লিখেছি দেখি!

মানস ॥ সেটা আমি ছিঁড়ে ফেলেছি ভাই।

তাপস ॥ ছিঁড়ে ফেলেছিস! কেন?

মানস ॥ আমার সম্বন্ধে তোর অতটা উচ্ছ্বাস—শুনেও যেমন লজ্জা হল, পড়তেও তেমনি লজ্জা পেলাম। ছিঁড়ে ফেললাম তাই।

তাপস ॥ সত্যি বলছিস?

মানস ॥ নয় তো কী!

তাপস ॥ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে আমার। কেমন যেন একটা অবসাদ বোধ করছি। আমি ভাই উঠি।

মানস ॥ বোস্, বোস্। নতুন একটা অভিজ্ঞতা কিনা, তাই এক পেয়ালা কফি খেলেই চাঙ্গা হয়ে যাবি। (ইলেক্‌ট্রিক্ বেল টিপিলেন, ভৃত্য দশরথ ডাকের চিঠিপত্র সহ প্রবেশ করিয়া চিঠিপত্র মানসের সামনে রাখিল। মানস সেগুলি দেখিতে দেখিতে) দু'পেয়ালা কফি। (দশরথ অন্দরে চলিয়া গেল।)

তাপস ॥ প্রত্যেক ডাকে তোর এত চিঠিপত্র আসে এখন?

মানস ॥ হ্যাঁ। এইটেই এখন সবচেয়ে বড় অত্যাচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেতকীর চিঠি আজ এসেছে দেখছি।

তাপস ॥ কি? খবর পেয়ে বুঝি লণ্ডনের পড়া-শোনা ছেড়ে দিয়ে অর্ধাঙ্গিনী উড়ে আসছেন স্বামীর কাছে, জয়ের ভাগ নিতে? এখনও এসে পৌঁছান নি দেখেই বরং আমি অবাক হচ্ছিলাম। তা' স্বামী গরবিনী আসছেন কবে?

সেদিন আসব।

মানস ॥ (চিঠি পড়িতে পড়িতে) আসছেন না।

তাপস ॥ সে কি! ভয় পাচ্ছেন নাকি?

মানস ॥ কি জানি, জানি না।

তাপস ॥ ও বাবা, ওটা তো দেখছি নয়া দিল্লীর চিঠি। কি? স্বয়ং কর্তা আসছেন নাকি?

মানস ॥ (চিঠি পড়িতে পড়িতে) না। তিনিও আসছেন না।

তাপস ॥ তোকে বুঝি যেতে লিখেছেন? আমন্ত্রণ জানিয়েছেন?

মানস ॥ না। তবে খুব অভিনন্দন জানিয়েছেন।

তাপস ॥ ওরে, শেষে কি তুই এক-ঘ'রে হবি মানস?

মানস ॥ হঁ্যা, তাই তো দেখছি। একে একে সবাই আমাকে বয়কট করছে। আমার বীক্ষণ যেন একটি অ্যাটমবোম্ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাপস ॥ ওরে মানস, আমিও আজ একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করে ফেললাম্।

মানস ॥ কি?

তাপস ॥ মুখে আমরা বলি বটে 'সত্যমেব জয়তে', কিন্তু সত্য থেকে দূরে থাকতেই চাই আমরা। ঘৃণা করি সবচেয়ে বেশী ঐ সত্যকে। আর শোন মানস, একটা ভবিষ্যদ্বাণীও আজ আমি করছি—

মানস ॥ কি?

তাপস ॥ তোমার এই যন্ত্র তুমি রক্ষা করতে পারবে না। চুরমার করে ফেলা হবে একে।

মানস ॥ চুরমার করবে! কে?

তাপস ॥ ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ—এই তিন শক্তি, এক যোগে, ছলে হোক, বলে হোক, কৌশলে হোক তোমার বীক্ষণকে ভক্ষণ করবে। তার চেয়েও বড় ভয় কি জান?

মানস ॥ কি?

তাপস ॥ এখন তুমি প্রাণে বাঁচলে হয়। যাক্। কফি এসে গেছে।

(দশরথ কফি আনিয়া উভয়ের সামনে রাখিল। উভয়ে নীরবে কফি পান করিতে লাগিলেন।)

॥ যবনিকা ॥

দাওয়াই

[সাঁওতাল পরগণার অরণ্যে সাঁওতাল-দম্পতি কথোপকথন রত। শেষ রাত্রি। অদূরে ব্যাঘ্র গর্জন।]

রাঙ্গী ॥ বাঘটা আবার এলো। উ হামাদের খাবে।

মংলু ॥ খাবে তুহাকে। দোষ করলি তু। তুহাকে আজ উ খাবে।

রাঙ্গী ॥ হামার দোষ না তুহার দোষ?

মংলু ॥ কাহার দোষ বাঘটা জানে। বাঘ একটা দেব্তা আছে।

রাঙ্গী ॥ যদি দেব্‌ত আছে—বিচার করবে।

মংলু ॥ উ বাঘ আর কি বিচার করবে? বিচার তো পঞ্চায়েৎ করলো। তবে হাঁ, সাজাটা দিবে উ বাঘ।

রাঙ্গী ॥ কি বিচার হলো। পঞ্চায়েৎ কী বিচার করলো? বিচার কেউ না করলো।

মংলু ॥ বিচার যদি না হবে, তু এখানে কেন? এই পাহাড়ে? এই জঙ্গলে? এই হাড়কাটা শীতে? বাঘ ভাল্লুকের মাঝে? খালি পরণের কাপড়টা নিয়ে? সূর্য ডুবলো, আর তুহাকে পঞ্চায়েৎ ঘাড় ধরে আনলো। খাবার না দিলো—পানি না দিলো। না দিলো একটা তীর ধনুক, না দিলো একটা বর্শা। বিচার যদি না হলো তবে পঞ্চায়েৎ বাবা সব তুহাকে এখানে আজ রাতে কেন বাঘের মুখে ঠেলে দিলো? কথাটা ভেবে দেখ রাঙ্গী—কথাটা ভেবে দেখ্—

রাঙ্গী ॥ মংলু বাবু, পঞ্চায়েৎ বাবা লোক খালি হামাকে বাঘের মুখে ঠেল্‌লো? তুহাকে না? তবে তু' এখানে মরতে এলি কেন?

মংলু ॥ তুহার চৌকিদার হামি!

রাঙ্গী ॥ চৌকিদার! কেমন চৌকিদার তু' মংলু বাবু? একটা তীর ধনুক তো তুহার না আছে। তুহার বাত শুনে মরতে বসেও হাসি পেল হামার। শুন মংলু বাবু, এর নাম বিচার না আছে। বিচার হোবে এখন—এখানে।

মংলু ॥ কার বিচার হোবে? হামার কোনো দোষ না আছে—দোষ আছে তুহার। বিচার হবে তো তুহার হোবে।

রাঙ্গী ।। তু' হাড়িয়া খাবি, মাতাল হবি, খসম হোয়ে এই বহুটাকে মারবি—
পিটবি। ইটা তুহার দোষ না হোলো? বাঃ—বাঃ—বা—

মংলু ।। আরে রাঙ্গী, থাম্ থাম্। হাড়িয়া খেলাম, তুহাকে পিট্‌লাম! তু শালী হাড়িয়া না খেলি, এই খসম্‌কে পিটলি ?

রাঙ্গী ।। হাঁ। পিট্‌লাম। তু' ঐ ছুড়িটাকে—ঐ ফুলিটাকে হামার আয়না-চিরুণ কেন দিলি ?

মংলু ।। ঐ এক কথা তুই বার বার বল্‌বি। তবে শুন, কেন দিলাম। ফুলি একদিন হামাকে বললো—

রাঙ্গী ।। কি বললো ?

মংলু ।। উহার খসম তুহার জন্যে পাগলা হলো—উহাকে আর পোছে না।

রাঙ্গী ।। তাই বুঝি উ হামার খসমকে পাগলা করবে? তাই বুঝি তু উহাকে দেখবি হামাকে না দেখবি। হামি সব বুঝি মংলুবাবু হামি সব বুঝি!

মংলু ।। কী বুঝলি ?

রাঙ্গী ।। (হঠাৎ চীৎকার করিয়া) তু' হামার আয়না, হামার চিরুণ ফুলিকে দিলি। বাঘ আজ তুহাকে খাবে—খাবে—খাবে। [ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

মংলু ।। এ রাঙ্গী! তু' হু-হু কেন করছিস?

রাঙ্গী ।। (শীতে হু হু করিতে করিতে) হু-হু-হু-হু—

মংলু ।। শীতে কাঁপছিস্। হামিও হি-হি-হি-হি—হি-হি-হি—হি-হি-হি—এ রাঙ্গী!

রাঙ্গী ।। হু হু-হু—হু-হু-হু—হু-হু-হু

মংলু ।। হি-হি-হি—হি-হি-হি—হি-হি-হি—শুন। জবর হাওয়া উঠলো। ঝড় এলো। শীতে না মরবি তো একটা কথা শুন রাঙ্গী—শুন!

রাঙ্গী ।। বল্। হু-হু-হু—হু-হু-হু—

মংলু ।। হি-হি হি—হি-হি-হি। পঞ্চায়েৎ বাবাসব খালি একটা চীজ্ হামাদের দিলো—ঐ একটা কম্বল। হি-হি-হি—হি-হি-হি—

রাঙ্গী ।। হু-হু-হু—। উ কম্বলটা রাখলো শিমুল গাছের মাথায়, মরদ হবি তো শিমুল গাছে উঠ—কম্বলটা পাড়। হু-হু-হু—

মংলু ।। হি-হি-হি—। শিমুল গাছে কাঁটা আছে তু না জানিস? উ কম্বল পাড়তে হবে তো হামার কাঁধে উঠবি তু—কম্বলটা পাড়বি তু। হি-হি-হি—হি-হি-হি—

রাঙ্গী ।। হু-হু-হু—। আয়—

মংলু ॥ চল্—

[এমনি করিয়া কম্বলটি শিমুল গাছ হইতে রাজী পাড়িয়া আনিল]

মংলু ॥ হি-হি-হি—কম্বলটা তু একলা নিলি ?

রাজী ॥ হু-হু-হু—হামি পাড়লাম, ইটা হামার।

মংলু ॥ হি-হি-হি—হামার কাঁধে উঠলি, তবে না ইটা পেলি ? ইটা হামার।

রাজী ॥ হু-হু-হু—মারামারি না করবি।

মংলু ॥ হি-হি-হি—তবে হামাকে নে তুহার বুকে।—হি-হি-হি—

রাজী ॥ হু-হু-হু—আয়।

[উভয়েই কম্বলে আচ্ছাদিত হওয়াতে হি-হি-হি ও হু-হু-হু কমিয়া গেল এবং পরে থামিয়াও গেল। ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর—]

মংলু ॥ কম্বলটা খুব গরম আছে।

রাজী ॥ হাঁ। খুব আরাম হোলো। (হঠাৎ চীৎকার করিয়া) হামার আয়না, হামার চিরুণ তু ফুলিকে কেন দিলি বল্।

মংলু ॥ শুন্, শুন্। কেন দিলাম শুন।

রাজী ॥ বল্। ঝুট্ বলবি তো হামি তুহাকে আজ কামড়াবে। বাঘের আগে হামি তুহাকে খাবে। কেনো দিল ফুলিকে হামার আয়না চিরুণ ? বজার কসম্, বল্।

মংলু ॥ ফুলিটা ভাবে খুব খাপ সুরৎ আছে ও। উহার খসম তুহাকে কেনো চুপি চুপি দেখবে ? উর মাথাতে সেটা ঢুকবে না। হামি তাই কি করলাম বুঝলি রাজী ?

রাজী ॥ কি করলি ?

মংলু ॥ তুহার আয়না তুহার চিরুণ উহাক্ দিলাম, চুপি চুপি উহাক্ বললাম দেখ ফুলি তেরে রূপের বাহারটা আপনা চোখে দেখ। এই আয়নাটাতে দেখ— আয়নাটার দাম আছে পাঁচ পাঁচটা টাকা। তুহার পাঁচসিকার আয়না ইটা না আছে।

রাজী ॥ উ দেখলো ?

মংলু ॥ দেখলো।

রাজী ॥ কি বললো ?

মংলু ॥ লাজ হোলো। কিছু না বললো। বুঝলো। নিজের মুখটা তুর আয়নাতে দেখল তবে বুঝলো।

রাঙ্গী ॥ তু কি বললি ?

মংলু ॥ বললাম, এই ফুলি, তুহার খসম হামার বহুটাকে কেন চুপি চুপি দেখ্‌বে, এবার সেটা বুঝলি ? কোন ফুলটার কেমন বাহার দেখলি ?

রাঙ্গী ॥ তু একথা বললি ?

মংলু ॥ বঙ্গার কসম, হামি বললাম। তু রাঙ্গী সেটা না শুনলি। তু' খালি দেখলি তুহার আয়না, তুহার চিরুণ হামি উহাক্‌ দিলাম।

রাঙ্গী ॥ মংলু বাবু—হামার মংলু বাবু—ই গোপন কথাটা হামাকে আগে বললে তুহাকে আমি পিট্‌তাম না। তুভি হামাকে পিটতি না। তালাকের কথা হামরা কেউ বলতাম না। পঞ্চায়েৎ শালা তবে হামাদের ই শীতের রাতে, ই পাহাড়ে, ই জংগলে এমন করে বাঘের মুখে ঠেলতো না।

মংলু ॥ তালাকের কথা যেই হবে পঞ্চায়েৎ লোক এই কাজটা করবে। ইটা হামাদের আইন আছে।

[হঠাৎ কিছুদূরে পুনরায় ব্যাঘ্র গর্জন। রাঙ্গী আর্তনাদ করিয়া উঠিল]

মংলু ॥ রাঙ্গী, চুপ ! বাঘ তোর গলা শুনবে।

রাঙ্গী ॥ তু হামাকে তোর বুকে আরো জোরে ধরে থাক।

[উষার আলো দিগন্তে ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সেখানে সর্দার পঞ্চায়েতের প্রবেশ। কম্বলাচ্ছাদিত দম্পতিকে দেখিয়া তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।]

সর্দার ॥ এ মংলু ! এ রাঙ্গী !

[কোনো সাড়া না পাইয়া তাহার হস্তস্থিত লাঠি দিয়া ইহাদের ঠেলা দিল। উভয়েই ধড়মড় জাগিয়া উঠিয়া সর্দারকে দেখিল। এবং তাহাকে হাসি মুখে নমস্কার জানাইল।]

সর্দার ॥ (মংলুকে) তালাক ?

মংলু ॥ না সর্দার—না।

সর্দার ॥ (রাঙ্গীকে) তালাক ?

রাঙ্গী ॥ (সলজ্জ হাসি হাসিয়া) না সর্দার না।

সর্দার ॥ বহুৎ আচ্ছা ! হামাদের হাতে এই দাওয়াইটা আছে তাই হামার জাতিটাতে তালাক না হবে—তালাক্‌ না হবে ! (হাসিয়া) চল্‌, ঘর চল্‌—

॥ যবনিকা ॥

এই হয়েছে আইন

[হবু চন্দ্র ভূপ—তাঁর রাজপ্রাসাদ। গবুচন্দ্র মন্ত্রী—যুক্তকরে দণ্ডায়মান এবং রাজার সঙ্গে কথোপকথন রত। নেপথ্য হতে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে—'জয় রাজা হবুচন্দ্রের জয়।' কিন্তু এই জয়ধ্বনি হাস্যমুখর।]

হবু।। বড়ই আনন্দের ঘটা দেখছি এবার আমার রাজ্যে। কেন বলতো গবু?

গবু।। মহারাজ পাঁচ বৎসর নানা তীর্থে পুণ্য অর্জন করে আপনি রাজ্যে ফিরে এসেছেন আজ। তাই প্রজাদের আজ এই আনন্দ উচ্ছ্বাস।

হবু।। গবু, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেছি বটে কিন্তু মন পড়ে থাকতো আমার এই আজব দেশে। কেবলই মনে হোত প্রজারা সুশাসনে রয়েছে তো? খেতে পরতে পারছে তো? আনন্দে আছে তো? তা দেখছি আমার অবর্তমানে এই পাঁচ বৎসর যে ভাবে সুশাসন করেছো তাতে আমার এই আজবদেশ রামরাজ্য হয়ে গেছে। রাজপথ দিয়ে যখন প্রাসাদে আসছিলাম তখন প্রজাদের মুখে কেবলই শুনেছি হো-হো হা-হা হাসি। আমার বড়ই আনন্দ হচ্ছে গবু। একটি নয় দুটি নয়, পাঁচ পাঁচটি বৎসর তুমি প্রজাদের এমন সুখশান্তিতে রেখেছো!

গবু।। সবই আপনার আশীর্বাদে সম্ভব হয়েছে মহারাজ। শুধু একটু বুদ্ধি খরচ। তাতেই এ রাজ্যের আবহাওয়া গেছে বদলে। রাজ্যে এখন কেবলই হাসি, হাসি ছাড়া আর কথা নেই মহারাজ।

হবু।। আমি জানি গবু, আমি জানি। তোমার বুদ্ধি বলেই আমি আছি। আমার কেবলই ভাবনা তুমি বুদ্ধিটা একটু বেশি খরচ না করে ফেল। তাই তোমাকে আমি বার বার বলি, আজও বলছি, কানে তুলো আর নাকে ছিপি এঁটে বুদ্ধিটা যতটা পার ধরে রাখবে। তোমার বুদ্ধির বাজে খরচ হলেই আমি গেছি গবু, আমি গেছি।

গবু।। না, না, বুদ্ধির বাজে খরচ আমি কখনো করি না। আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত, এইবার বিশ্রাম করুন। আমি রাজকার্যে গমন করি। জয় মহারাজ হবুচন্দ্রের জয়। [প্রস্থান]

[আড়ালে লুক্কায়িত একটি প্রজা হাসতে হাসতে বেরিয়ে হাসতে হাসতে রাজাকে প্রণাম জানায়]

হবু ।। কে হে, কে তুমি ? একি, তুমি এখানে লুকিয়ে কি করছিলে বাপু ? তোমার মতলবটা কি ?

প্রজা ।। হে-হে আজ্ঞে আমি বুদ্ধু। হে হে খেতে না পেয়ে হে হে চুরি করতে এসেছিলাম হুজুর। হা হা হা—হো হো হো !

হবু ।। খেতে না পেয়ে চুরি করতে এসেছিলে।

প্রজা ।। (হাসতে হাসতে) হ্যাঁ—

হবু। হাসছো কেন ? খেতে না পেলে লোকে কখনো হাসে ?

প্রজা ।। হাসে, হাসতে হয়। এই রাজ্যের নতুন আইনে হাসতে হয়। এইতো দেখুন আমি দুদিন খেতে পাইনি, স্ত্রী পুত্র দুদিন না খেয়ে উপোস করছে... হা, হা, হা—তাও দেখুন মহারাজ হাসছি।

হবু ।। তুমি একটা পাগল তাই হাসছো।

প্রজা ।। মহারাজ, তবে আপনার রাজ্যের সব প্রজাই আজ পাগল।

হবু ।। মানে—

প্রজা ।। হ্যাঁ মহারাজ, কারো পেটে ভাত নেই—কিন্তু দেখবেন সবাই হাসছে। হি হি করে হাসছে, হা হা করে হাসছে, দাঁত বার করে হাসছে—

হবু ।। রাজ্যে কারুর পেটে ভাত নেই ? এই ব্যাটা কি বলিস তুই ?

প্রজা ।। আজ্ঞে রাজ্যে আজ দুর্ভিক্ষ—হে হে হে—

হবু ।। দুর্ভিক্ষ ! কি করে বুঝবো দুর্ভিক্ষ ! হতচ্ছাড়া, তুই তো হেসেই অস্থির।

প্রজা ।। আজ্ঞে মহারাজ, গবু মন্ত্রী নতুন আইন করে দিয়েছেন হাসতেই হবে। খেতে না পাও হাসবে, পরতে না পাও হাসবে—জ্বর জারি হোক হাসবে—বাপ মা মরুক হাসবে—ছেলেপিলে মরুক হাসবে—কাঁদতে হয় সেও হেসে হেসে কাঁদবে।

হবু ।। বলিস কি রে ? এই হয়েছে আইন ?

প্রজা ।। হে হে, আজ্ঞে এই হয়েছে আইন।

হবু ।। এ আইন কেউ মানছে ?

প্রজা ।। হে হে, হা হা—মানছি শূলের ভয়ে হে হে মানছি !

হবু ।। শূলের ভয় ?

প্রজা ॥ আজ্ঞে হুজুর, যে মানবে না, তাকে শূলে চড়তে হবে। তাও হেসে হেসে শূলে চড়তে হবে।

হবু ॥ হেসে হেসে শূলে চড়তে হবে?

প্রজা ॥ আজ্ঞে হুজুর কেঁদে কেঁদে শূলে উঠলে—মরার পর আবার শূলে তোলা হবে তাকে—খাঁড়ার ঘায়ের মত।

হবু ॥ বলিস কিরে? এই হয়েছে আইন?

প্রজা ॥ হে হে—এই হয়েছে আইন।

হবু ॥ অবাক কাণ্ড। আইন সবাই মানছে? কেউ প্রতিবাদ করছে না?

প্রজা ॥ করছে হুজুর, করছে। হেসে হেসে করছে।

হবু ॥ কী সর্বনাশ। রাজ্যের আজ এই অবস্থা? প্রজারা বিদ্রোহ করছে না এই তো আশ্চর্য দেখছি।

প্রজা ॥ হ্যাঁ, বিদ্রোহও হচ্ছে হেসে হেসে হচ্ছে হুজুর, প্রজারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—তাও হেসে হেসে হে-হে।

(নেপথ্য হতে জনতার হাস্যমুখর নির্মম ঘোষণা ভেসে আসে—'হবু চন্দ্র রাজা নিপাত যাক-হে হে হে—গবু চন্দ্র মন্ত্রী নিপাত যাক—হো হো হো')

প্রজা ॥ হে হে হে শুনছেন তো?

হবু ॥ শুনছি, শুনছি। এমন হাসি আমি কখনো শুনিনি। এতো দেশ ঘুরেছি, কিন্তু এমন হাসি আমি কোথাও শুনিনি। আমার গা কাঁপছে। কোথায় গেল গবু? ওরে কে আছিস—গবুকে ডাক। (গবুচন্দ্রের প্রবেশ)

হবু ॥ এই যে গবু, তোমার এই রামরাজ্যে নাকি দুর্ভিক্ষ! খেতে পরতে পায় না?

গবু ॥ কে বলেছে মহারাজ এ কথা! খেতে পরতে না পেলে লোকে কখনো হাসে?

হবু ॥ হাসছে নাকি শূলের ভয়ে?

গবু ॥ মহারাজ হাসছে তো—হাসাটাই হচ্ছে বড় কথা মহারাজ। শূলে হাসছে কি বিনা শূলে হাসছে তা দেখবার তো আমাদের দরকার নেই মহারাজ।

হবু ॥ কিন্তু গবু, হাসছে বটে। কিন্তু তলে তলে ছুরি শানাচ্ছে। ওদের আওয়াজ শুনেই আমি বুঝছি।

(একদল সশস্ত্র প্রজা হাসতে হাসতে প্রবেশ করল)

জনতা ॥ (হাসতে হাসতে) হবু চন্দ্র রাজা নিপাত যাক—গবু চন্দ্র মন্ত্রী

নিপাত যাক্। (রাজা ও মন্ত্রীকে মারতে হাসতে হাসতে অস্ত্র উত্তোলন)

হবু ॥ গবু গবু রক্ষীরা কোথায়? সৈন্যরা কই?

প্রজাদলপতি ॥ (হাসতে হাসতে) তারাও আমাদের সঙ্গে হাসতে হাসতে যোগ দিয়েছে। রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করে রয়েছে তারা।

গবু ॥ বটে! (প্রস্থানোদ্যত। জনতা তাকে আটকায়)

হবু। তোমরা কি চাও?

দলপতি ॥ (হাসতে হাসতে) এই গবু মন্ত্রী, এই পাঁচ বৎসর আমাদের এমন শোষণ করেছে যে আজ আমাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই— আজ আমরা সব পেট পুরে খেতে চাই।

হবু ॥ (গবুকে) গবু, আর কেন? অনেক লুটপাট করেছো। পেটটিও অনেক মোটা হয়েছো। রাজভাণ্ডারটা এবার হেসে হেসে খুলে দাও।

দলপতি ॥ (হেসে) মহারাজের জয় হোক—মহারাজের জয় হোক—চলুন মন্ত্রীমশায়, হাসতে হাসতে আমাদের সঙ্গে চলুন। ভাণ্ডারটি খুলে দিন।

(গবুকে যেতে অনিচ্ছুক দেখে)

দলপতি ॥ (হাস্যহুঙ্কারে) চলুন—

গবু ॥ চলো—

প্রজারা ॥ হাসতে হাসতে চলুন—

গবু ॥ (অনিচ্ছার কাষ্ঠ হাসি হাসতে হাসতে) চলো—

(সশস্ত্র জনতা কর্তৃক পরিবৃত হয়ে বাহিরে গেল, রাজা গেল না।)

হবু ॥ গবুর অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি (অট্টহাসি)।

॥ যবনিকা ॥

কষ্টিপাথর

[একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নিয়োগ-সমিতির বৈঠক। পদপ্রার্থীদের পরীক্ষক, সভাপতি ও সদস্যসমেত তিনজন এবং প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। রুদ্ধ কক্ষ।]

সভাপতি ॥ (সম্পাদককে) আর কয়জন প্রার্থী আছে?

সম্পাদক ॥ (হস্তস্থিত তালিকা দেখিয়া) হয়ে গেছে, আর স্যার এখন বাকি মাত্র তিনজন।

সভাপতি ॥ বেশ। আজই শেষ করে দিন। একে একে ডাকুন ওদের।

সম্পাদক ॥ হ্যাঁ স্যার। (সম্পাদক বাহিরে চলিয়া গেলেন)

সভাপতি। পদটির যা দায়িত্ব, তা'তে বেতন আরো বেশি হওয়া উচিত ছিলো।

১ম সদস্য ॥ নিশ্চয়। মাসিক হাজার টাকা আজকের দিনে একটা বেতন নাকি?

২য় সদস্য ॥ বটেই তো। ছেলেদের মধ্যে যারা আজকাল একটু 'উজ্জ্বল' তারা চাকরির দিকে ঘেঁষে না। বাইরেই রোজগারের সুবিধা-সুযোগ অনেক বেশি।

সভাপতি ॥ তা সত্যি। সে সব সুযোগ-সুবিধা যাদের নেই, তারাই আসে এখন চাকরি করতে।

(কর্মপ্রার্থী একটি যুবক পরীক্ষা দিতে আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।)

যুবক ॥ নমস্তে।

সকলে ॥ নমস্তে।

সভাপতি ॥ নাম?

যুবক ॥ ধনঞ্জয় রায়।

সভাপতি ॥ ১৯৬০ সালে কমার্সে এম, এ পাশ করে এ' ক'বছর বসেই আছেন?

ধনঞ্জয় ॥ হ্যাঁ স্যার।

১ম সদস্য ॥ কোন্ ক্লাস পেয়েছিলেন?

ধনঞ্জয় ॥ ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড।

সভাপতি ॥ আপনি এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির সম্পর্কে কি জানেন?

ধনঞ্জয় ॥ প্রতিষ্ঠানটি আমাদের দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ না হলেও কাছাকাছি। এর আমদানী এবং রপ্তানি বিভাগ, দুই-ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ

প্রতিষ্ঠানটি দেশের একটি সম্পদ।'

সভাপতি ॥ দেখুন, আপনি কমার্সে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছেন। বাণিজ্য বিষয়ক কোন প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই না। আমরা জানি, ওসব আপনি ভালোই জানেন। আমরা প্রশ্ন করবো প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে।

ধনঞ্জয় ॥ করুন।

সভাপতি ॥ যে পদটির আপনি প্রার্থী, তার দায়িত্ব খুবই বেশি। ব্যবসায় লাভ লোকসান অনেকটা নির্ভর করবে আপনার আচরণের উপর।

ধনঞ্জয় ॥ নিশ্চয় স্যার।

সভাপতি ॥ প্রতিষ্ঠানটির সুনামও বজায় রাখতে হবে আপনাকে।

ধনঞ্জয় ॥ নিশ্চয় স্যার। সুনাম গেলে ব্যবসাটিও যাবে।

সভাপতি ॥ ধরুন, যে কারণেই হোক না কেন, দেশে দুর্ভিক্ষ হল। চালের দর হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। চালের সঙ্গে কাঁকর ভেজাল দিয়ে আশাতীত মুনাফা হতে পারে। আপনি কি এই ভেজাল দেওয়া সমর্থন করবেন!

ধনঞ্জয় ॥ না।

১ম সদস্য ॥ প্রতিষ্ঠানটির তাতে কিন্তু ভীষণ ক্ষতি হবে।

ধনঞ্জয় ॥ হোক। দেশের লোক হয়ে দেশের লোককে বঞ্চনা করা এই দেশী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কখনোই উচিত হবে না স্যার। সেটা হবে দেশদ্রোহিতা।

২য় সদস্য ॥ ধরা পড়লে তবে তো? ধরুন, বিদেশ থেকে, এই ধরুন জার্মানী থেকে, এমন একটি মেসিন আমদানী করা হলো, যাতে পাথরের কুচি ভেঙে মিহি চালের চেহারাটি এনে দেওয়া যায়। ডেলিভারীর সময় আসল নকল ধরবার উপায়ই থাকবে না। এরকম পরিকল্পনা সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

ধনঞ্জয় ॥ এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আপনারা আমাকে বাজিয়ে নিচ্ছেন এই যা। আমি জানি দেশের এত বড় এই প্রতিষ্ঠানটি এরকম কোনো পরিকল্পনা চিন্তাও করতে পারে না। এমন একটা পরিকল্পনা করাই পাপ।

সভাপতি ॥ শুনে খুশি হচ্ছি। জানেন তো, আজকাল কি না হচ্ছে তাই একবার—

১ম সদস্য ॥ হ্যাঁ, যাচাই করে নেওয়া ভালো।

২য় সদস্য ॥ তা বৈকি।

সভাপতি ॥ আচ্ছা, আপান যেতে পারেন!

ধনঞ্জয় ॥ নমস্তে।

সকলে ॥ নমস্তে। (ধনঞ্জয় চলিয়া গেল)

সভাপতি ॥ চেহারা দেখেই ছেলেটিকে আমি বুঝে নিয়েছিলাম।

উভয় সদস্য ॥ আমরাও।

সভাপতি ॥ না, এরকম খোলাখুলি আলোচনা ভালো।

(দ্বিতীয় যুবকের প্রবেশ)

যুবক ॥ নমস্কার।

সকলে ॥ নমস্কার।

সভাপতি ॥ বসুন। (যুবক বসিল)

সভাপতি ॥ নাম?

যুবক ॥ তরুণ মিত্র।

সভাপতি ॥ আপনি দেখছি, বি. কম. এল. এল-বি।

তরুণ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

সভাপতি ॥ এল. এল-বি পাশ করেছেন আজ তিন বছর?

তরুণ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

সভাপতি ॥ ওকালতি করলেন না কেন?

তরুণ ॥ করতে গিয়েছিলাম। ধাতে পোষালো না স্যার।

সভাপতি ॥ কেন, কেন?

তরুণ ॥ আজ্ঞে স্যার, ওকালতী মানেই মিথ্যার বেসাতি। বিবেকটি বিক্রয় করতে পারলে তবে ওতে টাকা। আমি পারলাম না।

সভাপতি ॥ আপনি কি তবে বলতে চান, সব উকিলই অসৎ?

তরুণ ॥ (ভয় পাইয়া) না স্যার, তা আমি মোটেই বলছিনে। তবে আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখলাম, সৎপথে থেকে ওখানে টাকা রোজগার করা খুব দুরূহ। আমার পোষালো না, তাই ছেড়ে দিলাম।

১ম সদস্য ॥ তাই বলুন।

২য় সদস্য ॥ ওটা আপনার ব্যক্তিগত মত। কি বলেন?

তরুণ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

সভাপতি ॥ আপনি যে প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্যে এসেছেন, তার সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

তরুণ ॥ এ প্রতিষ্ঠানে আমার চাকরি হলে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করবো। এ প্রতিষ্ঠানটির সুনাম দেশ বিখ্যাত।

সভাপতি ॥ আচ্ছা ধরুন, আপনার চাকরি হলো। গভর্ণমেণ্ট থেকে একটা

লাইসেন্স বের করতে হবে আপনাকে। লাইসেন্সটা এখনি বের করা দরকার। দেরি হলে প্রতিষ্ঠানের সমূহ ক্ষতি হবে। লাইসেন্সটা আপনি চটপট বের করে নিতে পারেন, যদি কিছু টাকা ঘুষ দেওয়া যায়। আপনি কি করবেন? ঘুষের প্রস্তাব সমর্থন করবেন, কি করবেন না?

তরুণ ।। আমি সমর্থন করবো না। ঘুষ দিতে দিতেই আজ আমাদের দেশের এত দুরবস্থা। ঘুষ দেওয়াটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বক্ষেত্রে নিয়ম। ঘুষ না দেওয়াটা একটা ব্যতিক্রমে দাঁড়িয়েছে, এতে জাতীয় চরিত্রই নষ্ট হয়ে গেছে।

সভাপতি ।। বাঃ সুন্দর বলছেন।

১ম সদস্য ।। ঘুষের প্রস্তাব আপনি সমর্থন না করে প্রতিষ্ঠানটির প্রচুর টাকার ক্ষতির কারণ হচ্ছেন কিন্তু।

তরুণ ।। হ্যাঁ তা হচ্ছি। হচ্ছি এই সাহসে যে, এটি দেশের আদর্শ প্রতিষ্ঠান। আমি দেখেছি যারা গরীব তাদের ঘুষ না দিয়ে উপায় থাকে না, কারণ, ক্ষতিটা সইবার শক্তি তাদের কম। কিন্তু যারা ধনী, তারা ক্ষতি সইতে পারে, আর আদর্শ সমাজ গড়ে তুলবার জন্য এ ক্ষতি তাদের সহ্য করাও উচিত।

সভাপতি ।। বুঝলাম। ঘুষ দিয়ে কাজ আদায় করার বিরোধী আপনি—তাতে যত ক্ষতিই হোক। কেমন?

তরুণ। হ্যাঁ স্যার।

সভাপতি ।। ব্যক্তিগত ভাবে, আপনি আপনার কোনো কাজে কাউকে কখনো ঘুষ দেন নি?

তরুণ ।। না স্যার, দেইনি। ঘুষ দিলে আমার ভালো চাকরি হতে পারতো, এরকম প্রস্তাব আমি পেয়েছিলাম, আমি ঘুষ দিইনি। চাকরিও আমার হয়নি। সেই চাকরি ঘুষ দিয়ে আমারই এক বন্ধু পেয়েছে, এও আমি জানি।

১ম সদস্য ।। (হাসিয়া) এ চাকরির জন্য চেষ্টা করতে এসেও ঘুষের প্রস্তাব আপনার কাছে এসেছে নাকি?

তরুণ ।। (জিভ কাটিয়া) এ আপনি কি বলছেন স্যার? এত বড় প্রতিষ্ঠান—আর আপনাদের মত পরীক্ষকরা যেখানে রয়েছেন. সেখানে—ছিঃ ছিঃ—স্যার!

সভাপতি ।। ভারি খুশি হলাম। তবে কি জানেন, আমাদের সব যাচাই করে দেখতে হয়!

১ম সদস্য ।। কি রকম লোক আমরা নেব, বাজিয়ে নিতে হবে তো!

২য় সদস্য ।। বটেই তো, বটেই তো! নাঃ আপনার দেখছি সৎ সাহস আছে।

সভাপতি ॥ নিশ্চয় ! আচ্ছা, আপনি আসুন। আমাদের আর কিছু জিজ্ঞাসার নেই। (সদস্যদের প্রতি) কি বলেন?

১ম সদস্য ॥ যিনি এত মেহনৎ করে ওকালতী পাশ করেও ওকালতী করলেন না, শুধু বিবেকের তাড়নায়—তাঁর সাধুতা সম্পর্কে আমাদের আর কোনো সন্দেহ নেই।

২য় সদস্য ॥ বটেই তো। এক আঁচড়েই লোক চেনা যায়।

সভাপতি ॥ আচ্ছা আসুন, নমস্কার।

তরুণ ॥ নমস্কার। [তরুণের প্রস্থান]

সভাপতি ॥ আচ্ছা, আর বাকী আছে বোধ হয় একটি।

১ম সদস্য ॥ হ্যাঁ। এইটিই শেষ।

২য় সদস্য ॥ হ্যাঁ, ঐ যে তিনিও এসে গেছেন।

(তৃতীয় এবং শেষ যুবকের প্রবেশ)

যুবক ॥ জয়হিন্দ্!

সকলে ॥ (পরস্পরের প্রতি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া) জয়হিন্দ্!

সভাপতি ॥ বসুন। নাম?

যুবক ॥ যুধিষ্ঠির বসু।

সভাপতি ॥ বাঃ বেশ নামটি তো!

১ম সদস্য ॥ হ্যাঁ। নামেও মানুষকে অনেকটা চেনা যায়।

২য় সদস্য ॥ তা বৈকি! একটা প্রবাদই দাঁড়িয়ে গেছে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠির ॥ আজ্ঞে, আমার বাবার নামও শ্রীধর্মরাজ বসু।

সভাপতি ॥ বেঁচে আছেন?

যুধিষ্ঠির ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

২য় সদস্য ॥ কি করেন?

যুধিষ্ঠির ॥ করতেন মাস্টারী, এখন বেকার।

১ম সদস্য ॥ কেন?

যুধিষ্ঠির ॥ নতুন স্কীমে তাঁর মাইনে দাঁড়ালো দু'শ টাকা। সেক্রেটারী বললেন কাগজে কলমে দু'শ টাকা থাকবে, দেওয়া হবে তাঁকে একশ। তাঁকে রসিদ দিতে হবে কিন্তু দু'শ টাকায়। 'ধ্যেৎ' বলে বাবা চাকরিটা ছেড়ে দিলেন।

সভাপতি ॥ যাক, দেশে এরকম লোক তবে এখনো আছে?

২য় সদস্য ॥ আছে বৈকি! রামায়ণ মহাভারত যতদিন এদেশে আছে, এসব

লোক থাকবেন বৈকি।

সভাপতি ।। কিন্তু খুব কম।

যুধিষ্ঠির ।। এবং তাঁরা প্রায় সবলেই একরকম অনাহারেই থাকেন স্যার।

সভাপতি ।। যাক এসব আলোচনা থাক। আপনি দেখছি গ্রাজুয়েট, তার ওপর বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডিপ্লোমা পেয়েছেন।

যুধিষ্ঠির ।। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আর তা পেয়েছি বলেই খুব আশা করে আজ ইণ্টারভিউ দিতে এসেছি।

২য় সদস্য ।। বটেই তো, বটেই তো! এ ডিপ্লোমা আমরাএ পর্যন্ত আর কারো পাইনি।

সভাপতি ।। হ্যাঁ। আচ্ছা আপনি এই প্রতিষ্ঠানটির সম্পর্কে কতটা জানেন?

যুধিষ্ঠির ।। শুধু আমি নয় স্যার, দেশের লোক সবাই জানে, এ আমাদের জাতীয় গর্ব। গত অ্যানুয়েল জেনারাল মিটিং-এ চেয়ারম্যান শেয়ার হোল্ডারদের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে দেখছি, কি আমদানীতে কি রপ্তানীতে এর কর্মক্ষেত্র যে রকম বেড়ে চলেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে এ প্রতিষ্ঠান সমগ্র দেশের একটি মহাসম্পদ হয়ে দাঁড়াবে। গোটা পৃথিবীতে আজ এর নাম ছড়িয়ে পড়েছে।

সভাপতি ।। সুন্দর। সব জানেন দেখছি। আচ্ছা ধরুন, এখানে আপনার চাকরি হলো। আপনার দায়িত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের লাভ ক্ষতি দেখা একটা গুরুতর দায়িত্ব।

যুধিষ্ঠির ।। নিশ্চয়।

সভাপতি ।। আপনি আয়-করের ব্যাপারটা বেশ বোঝেন?

যুধিষ্ঠির ।। আজ্ঞে স্যার আয়করই আমার স্পেশাল পেপার ছিলো।

সভাপতি ।। বাঃ! তবে তো আর কথাই নেই! আচ্ছা ধরুন, আজকাল ব্যবসায়ে যা আয়কর চেপেছে তা যে অনেকটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে— এ কথা কি আপনি স্বীকার করেন?

যুধিষ্ঠির ।। অনেকে তা বলেন বটে। কিন্তু সরকারও তো অনেকটা নিরুপায়। দেশকে গড়ে তুলতে হলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য প্রচুর টাকার দরকার। তারপর দেশরক্ষার খাতেও এখন খুবই মোটা টাকা ব্যয় হচ্ছে। এজন্য ইন্‌কাম-ট্যাক্সই সরকারের প্রধান আয়।

সভাপতি ।। নিশ্চয়, নিশ্চয়! না না, সরকারের কোনো দোষ দিচ্ছি না আমরা। লাভের ওপর ইনক্যামট্যাক্স আইনতঃ যা দেওয়া দরকার তা দিতে হবে

বৈকি! আমি সেকথা বলছি না। আমি জানতে চাই, আপনার 'বস' যদি আপনাকে বলেন, 'ওহে, এত ইনকামট্যাক্স দিতে গেলে দুধে হাত পড়ছে যে! অত টাকা লাভ না দেখালে কিন্তু বেশ কিছুটা ট্যাক্স এড়ানো যায়।' আপনি তাতে কি বলবেন? রাজি হবেন?

যুধিষ্ঠির ॥ না স্যার। অনেক ফার্মে দু'সেট খাতা রাখা হয়। ইনকামট্যাক্সের জন্য তৈরি করা নকল এক সেট, আর আসল একসেট। এ প্রতিষ্ঠান এসব কল্পনা করতে পারে এ আমার কল্পনার বাইরে।

সভাপতি ॥ এতে আপনার মনে আর কোনো দ্বিধা নেই তো?

যুধিষ্ঠির ॥ না স্যার।

সভাপতি ॥ ধন্যবাদ।

অন্য দুই সদস্য ॥ নিশ্চয়।

সভাপতি ॥ আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন।

১ম সদস্য ॥ আপনার স্পষ্টবাদিতায় আমরা খুশি হয়েছি।

২য় সদস্য ॥ বটেই তো!

যুধিষ্ঠির ॥ আমার বাবা বলেন ভারত সরকারের মটোটি সর্বক্ষেত্রে স্মরণীয়।

সভাপতি ॥ কোন মটো-টি?

যুধিষ্ঠির ॥ 'সত্যমেব জয়তে।'

সভাপতি ॥ বাঃ।

প্রথম সদস্য ॥ চমৎকার।

দ্বিতীয় সদস্য ॥ বটেই তো। তিনি একথা বলবেন না তো আর কে বলবে! সত্যের জন্য চাকরিটাই ছেড়ে দিলেন!

যুধিষ্ঠির ॥ আর স্যার, তাই আমার আশা, তাঁরই রক্ত যখন এ দেহে, এ চাকরিটা হয়তো আমি পাব। কথাটা আবেগে বেরিয়ে এল—কিছু মনে করবেন না স্যার। আচ্ছা, আসি, জয় হিন্দ।

(যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান)

সকলে ॥ জয়হিন্দ!

সভাপতি ॥ বলুন এইবার।

প্রথম সদস্য ॥ আমাদের 'কোডে' বলবো তো?

সভাপতি ॥ নিশ্চয়।

প্রথম সদস্য ॥ সব গরু আর গাধা। (দ্বিতীয় সদস্যকে) আপনি কি বলেন?

দ্বিতীয় সদস্য ॥ তা নয় তো কি ? এরা চেয়ারে বসলে দুদিনেই লালবাতি।

তৃতীয় সদস্য ॥ তা আর বলতে!

সভাপতি ॥ তার চেয়েও বড় কথা, লালবাতি জ্বলারও আগে কর্তাদের হাতে পড়বে দড়ি।

অন্য দুই সদস্য ॥ নিশ্চয়—নিশ্চয়।

সভাপতি ॥ কর্তৃপক্ষ চাইছেন শেয়াল।

অন্য দুই সদস্য ॥ এদের একটিও নয়।

সভাপতি ॥ আমরা তিনজনেই একমত। সেক্রেটারি—

(পার্শ্ব কক্ষ হইতে সম্পাদক ছুটিয়া আসিলেন)

সম্পাদক ॥ বলুন স্যার—

সভাপতি ॥ একটি প্রার্থীও কাজের উপযুক্ত নয়।

সম্পাদক ॥ তবে ?

সভাপতি ॥ রি-এডভারটাইজ। আবার বিজ্ঞাপন দিন।

সম্পাদক ॥ কিন্তু স্যার, কর্তৃপক্ষ এখনি লোক চাইছেন। আবার বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক নিতে গেলে—অন্ততঃ আরো তিন মাস।

সভাপতি ॥ কিন্তু তাই বলে অনুপযুক্ত লোক তো আর নেওয়া চলে না। সব প্রার্থীই তো দেখলাম—

দ্বিতীয় সদস্য ॥ দেখলাম মানে! সব বাজিয়ে নিয়েছি।

তৃতীয় সদস্য ॥ কষ্টিপাথরে ঘসে দেখেছি আমরা।

সভাপতি ॥ কোনটিকে দিয়েই চলবে না।

সম্পাদক ॥ আচ্ছা স্যার, এই মাত্র একটি প্রার্থী ছুটতে ছুটতে এসে পড়েছে। বোম্বে থেকে আসছে—প্লেনের কি গোলমাল হয়েছিল—তাই সময়মত হাজিরা দিতে পারে নি। দেখবেন একবার তাকে ?

সভাপতি ॥ বেশ, দেখছি। দিন পাঠিয়ে। (সম্পাদকের প্রস্থান)

সভাপতি ॥ দেখাই যাক্ না রি-এডভারটাইজ করতে গেলে যখন তিনমাস হবে দেরি।

দ্বিতীয় সদস্য ॥ আমরা কোন পাথর উল্টে দেখতে বাকি রাখবো না।

তৃতীয় সদস্য ॥ বটেই তো।

(শেষ প্রার্থী আসিল। যুবকটির মাথায় টিকি। কপালে চন্দন ফোঁটা)

যুবক ॥ শুভমস্তু।

সভাপতি ॥ কি মন্ত্র?

যুবক ॥ শুভমস্তু। সকলের মঙ্গল হোক্।

সভাপতি ॥ ও! শুভমস্তু! বাঃ।

অপর দুই সদস্য ॥ বাঃ, শুভমস্তু।

সভাপতি ॥ নাম?

যুবক ॥ ঈশ্বরদাস দাস।

সভাপতি ॥ আপনি শুধু বি-কম্।

ঈশ্বরদাস ॥ কিন্তু অভিজ্ঞতা আমার কম নয় স্যার। বি, কম্ পাশ করে এই চার বছরে চারটে ফার্মে কাজ করেছি। এক ফার্ম থেকে আর এক ফার্মে ধরে নিয়ে গেছে প্রত্যেকবার বেশি বেতন দিয়ে।

সভাপতি ॥ তাই দেখছি। আড়াই শো থেকে সুরু হয়ে, বোম্বের এখন যে ফার্মে আছেন, সেখানে পাচ্ছেন হাজার।

ঈশ্বরদাস ॥ হ্যাঁ স্যার—হাজার।

সভাপতি ॥ এ পোস্টের বেতনও হাজার। তবে এখানে আসতে চাইছেন কেন?

ঈশ্বরদাস ॥ চাইবো না! এ ফার্মের তুলনা আছে! উন্নতির এখানে কত সুযোগ! কত প্রসপেক্টস্!

সভাপতি ॥ তার মানে এ প্রতিষ্ঠানটির মান মর্যাদা আপনি জানেন।

ঈশ্বরদাস ॥ নিশ্চয়। এখানে কাজ করা হবে গর্ব আর গৌরবের বিষয়।

সভাপতি ॥ আচ্ছা ধরুন, আপনার চাকরি এখানে হয়েছে। কমার্সিয়াল ফার্মে নানারকম 'করাপসান'-এর সম্ভাবনা থাকে—যাকে বলা হয় দুর্নীতি।

ঈশ্বরদাস ॥ তা যদি বলেন, দুর্নীতিই আজ নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে স্যার।

সভাপতি ॥ মানে?

ঈশ্বরদাস ॥ মানে দুর্নীতিটাই আজকের দিনে 'ভারচু'—নীতিটাই 'ভাইস'।

সভাপতি ॥ আশা করি এটা আপনি সমর্থন করেন না?

ঈশ্বরদাস ॥ না করে উপায় নেই স্যার। শাস্ত্রেই বলেছে 'যস্মিন দেশে যদাচারঃ'।

সভাপতি ॥ 'অনেস্টি ইজ দি বেষ্ট পালিসি' আপনি মানেন না?

ঈশ্বরদাস ॥ ওটা ছিল সে যুগে। এ যুগে 'ডিজ-অনেস্টি ইজ দি বেস্ট পলিসি।' এ নিয়ে আমি একটা থিসিস লিখেছি। আমি এটা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দিয়েছি, ফ্যাকট্ দিয়ে—ফিগার দিয়ে।

সভাপতি ॥ ভেরি ইন্টারেষ্টিং!

প্রথম সদস্য ।। ইন্টারেস্টিং সন্দেহ নেই, কিন্তু ডিজঅনেস্টি আপনার বিবেকে বাধবে না?

ঈশ্বরদাস ।। না স্যার। আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী। আমি ঘুম থেকে উঠতে আর শুতে যেতে হাত জোড় করে বলি—"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

তৃতীয় সদস্য ।। ঐ কথা বলেই আপনি পাপ থেকে মুক্তি পাবেন?

ঈশ্বরদাস ।। হ্যাঁ স্যার পাব—কারণ আমি সদা সর্বদা মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করি আর বলি—

"মৎসম পাতকী নাস্তি, পাপঘ্নি ত্বৎ সম নহি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি! যথা যোগ্যং তথা কুরু।"

সভাপতি ।। আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন।

ঈশ্বরদাস ।। যাচ্ছি স্যার। বুঝলাম তাড়িয়েই দিচ্ছেন। তা দিন।

"সারথি চালান যিনি জীবনের রথ।
তিনিই জানেন শুধু কার কোথা পথ ।।
আমি ভাবি আমি বুঝি পথের প্রহরী।
পথ দেখাইতে গিয়ে, পথ রোধ করি ।।"

ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। (ঈশ্বরদাস চলিয়া গেল।)

সভাপতি ।। (অন্য দুই সদস্যকে) বলুন।

সদস্যদ্বয় ।। (একযোগে)। শেয়াল।

সভাপতি ।। শেষটায় তবে একটি পাওয়া গেল।

প্রথম সদস্য ।। শুধু শেয়াল নয়, শেয়াল পণ্ডিত।

দ্বিতীয় সদস্য ।। বটেই তো!

সভাপতি ।। তাহলে, একেই—

উভয় সদস্য ।। তা আর বলতে!

সভাপতি ।। সেক্রেটারি! (পার্শ্ব কক্ষ হইতে সেক্রেটারি ছুটিয়া আসিলেন।)

সম্পাদক ।। বলুন স্যার।

সভাপতি ।। অর্ডার লিখুন—। ঈশ্বরদাস দাসকে পদটির জন্য আমরা মনোনীত করছি। প্রাথমিক নিয়োগেই তাকে উচ্চতর বারশো টাকার গ্রেড্ দেওয়া যেতে পারে। (সদস্যদের প্রতি) কি বলেন?

উভয় সদস্য ।। বটেই তো!

—যবনিকা—

চক্রবর্তী।। অমলাকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলে তো? কি বুঝলে?
ডাক্তার।। দেখে শুনে তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে হয়। অথচ তুমি যা বলছো, সেতো এক অদ্ভুত ব্যাপার। কতদিন থেকে এ লক্ষণটা দেখছো?
চক্রবর্তী।। এ বছর সে তীর্থ করে ফিরে এলো। তারপর থেকেই এই পাগলামো সুরু হয়েছে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব দেখছে।
ডাক্তার।। তা দেখছে, দেখুক। মিলছে নাতো কিছু।
চক্রবর্তী।। মিলছে নাই বা বলি কি করে। কিছুটা মিলছে বৈ কি!
ডাক্তার।। বেশতো মিলুক না। জ্যোতিষীরাও তো কত কথা বলে। কিছুটা মেলেও। তাতে পৃথিবীর কার কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হচ্ছে!
চক্রবর্তী।। না না, শোনো ভাই ডাক্তার, অমলার সহোদর ভাই তুমি। তাই বলতে পারি এক তোমাকেই। বিপদ হয়েছে কি জানো?
ডাক্তার।। কি?
চক্রবর্তী।। অমলা যা কিছু বলছে—বলছে শুধু আমারই সম্পর্কে।
ডাক্তার।। বেশ তো। তাতে তোমার ক্ষতিটা কি হচ্ছে?
চক্রবর্তী।। হচ্ছে না? আমি কাল কোথায় কি করেছি, আজ এখন কি ভাবছি, ও বেলা কি করবো—এটা ও নখদর্পণে দেখছে।
ডাক্তার।। নখদর্পণে? হাঃ—হাঃ—হাঃ—
চক্রবর্তী।। না না, তুমি হেসোনা ডাক্তার। হাসবার কথা এটা মোটেই নয়। সত্যি সত্যি অমলা তার নখ আনে চোখের সামনে। নখ দেখে আর বলতে থাকে। ওর নখের পর্দায় যেন আমার জীবনের ছবি সিনেমার মত ভেসে ওঠে। ও দেখে আর বলে।
ডাক্তার।। সত্যি বলছো!—যা বলছে তা মিলছে?
চক্রবর্তী।। আঃ, কতবার বলবো! মিলছে বলেই তো বিপদ। না মিললে তো এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকারই ছিলোনা।
ডাক্তার।। বটে! তাইতো! কি করে এটা সম্ভব হলো?
চক্রবর্তী।। তীর্থ-টীর্থ করতে গিয়েছিলো; সাধু টাধু অনেক ঘেটেছে, একটা বিভূতি-টিভূতি মিলে গেছে হয় তো!
ডাক্তার।। নখদর্পণে শুধু তোমাকেই দেখছে, না আর কাউকে?

চক্রবর্তী ॥ দেখেন উনি আমারই সব ঘটনা। সে সব ঘটনা যাদের সঙ্গে ঘটে তাদেরও দেখেন বৈকি। একেবারে যেন হুবহু দেখেন।

ডাক্তার ॥ আশ্চর্য। সব তোমারই ঘটনা?

চক্রবর্তী ॥ সব আমারই ঘটনা।

ডাক্তার ॥ এ পক্ষপাতটা কেন?

চক্রবর্তী ॥ আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললেন, তুমি আমার চিন্তা, তুমি আমার ভাবনা, শয়নে-স্বপনে নিদ্রা জাগরণে তোমাকে ছাড়া আর কারো কথা আসে না আমার মনে।

ডাক্তার ॥ তবে বলতে হচ্ছে, আশ্চর্য মানুষের মনের শক্তি, আশ্চর্য একনিষ্ঠতার ক্ষমতা। পুরাকালে একনিষ্ঠ সতীরা ছিলেন এমনি। আমি দুঃখিত হচ্ছিনা ভাই, বরং গর্ব অনুভব করছি আমার এই ভগ্নিটির জন্য।

চক্রবর্তী ॥ কিন্তু আমি এটা একেবারেই সইতে পারছি না ডাক্তার।

ডাক্তার ॥ কেন বলো তো?

চক্রবর্তী ॥ সে কি বুঝছো না?

ডাক্তার ॥ ও, বুঝেছি। অকাজ-কুকাজ সব ধরা পড়ে যাচ্ছে বুঝি নখদর্পণে।

চক্রবর্তী ॥ না না, অকাজ-কুকাজ এমন কিছু নয়। তবে কিনা—না না, জীবনে কত কথা, কত কাজ থাকে যা অপ্রকাশ্য। কিছুটা গোপনতা কার না কাম্য? তোমার স্ত্রীটি যদি এমনি হতো, তোমার সব গোপন কথা ফাঁস করে দিতো, ভালো লাগতো তোমার? অপ্রস্তুত হতে না তুমি সবার সামনে? মান-মর্যাদা থাকতো তোমার?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ তা তো বটেই। এখন বুঝছি, আমি হয়তো তা যতটা সইতে পারতাম, তোমার পক্ষে তা অসম্ভব, কারণ, তুমি একজন দেশবরেণ্য নেতা। নামেও চক্রবর্তী—নেতৃত্বেও রাজচক্রবর্তী।

চক্রবর্তী ॥ এতক্ষণে আমার বিপদটা তুমি ধরতে পেরেছো। ভাষার সৃষ্টি হয়েছে মনের কথা গোপন করতে, আর নেতৃত্বে সৃষ্টি হয়েছে সত্যিকার ঘটনা গুপ্ত রাখতে। রাজনীতিতে এর নামই মন্ত্রগুপ্তি।

ডাক্তার ॥ তা, বেশ তো। অমলাকে কিছুদিন সবার থেকে আলাদা করে রাখো না।

চক্রবর্তী ॥ চেষ্টা করেছিলাম। তাতে ওর চেঁচামেচি এত বেড়ে যায় যে বাড়িশুদ্ধ লোক আমার সব অজানা কাহিনী শুনতে পায়।

ডাক্তার ॥ বেশ তো, আমার ওখানে দিন কয়েকের জন্য পাঠিয়ে দাও।

চক্রবর্তী ॥ তাও বলেছিলাম। রাজি নয়। আমাকে ছেড়ে কোনোখানে যেতে একেবারেই রাজি নয়।

ডাক্তার ॥ বিশ্বাসী কাউকে সঙ্গে দিয়ে হিমালয়ের কোনো তীর্থে পাঠিয়ে দাও। তীর্থ তো অমলা ভালোবাসে।

চক্রবর্তী ॥ না। তাতেও আর রাজি নয়। বলে সব তীর্থ করে যে পুণ্য হয়েছে তারই ফলে পেয়েছে এই দিব্য ক্ষমতা; রক্ষাকবচের মতো এখন আমাকে করবে রক্ষা।

ডাক্তার ॥ তা এতো ভালো কথা। রক্ষা-কবচ—সে তো ভালো কথা।

চক্রবর্তী ॥ রক্ষা কবচ তুমি কাকে বলছো? আমার সব কথা ফাঁস করে দিলে, আমি রক্ষা পাবো না মরবো?

ডাক্তার ॥ অনেক বুঝি গলদ ভায়া?

চক্রবর্তী ॥ নেতৃত্ব মানেই গলদ। আশাকরি, তুমি এত অবুঝ নও যে সেটা বুঝতে পারো না।

ডাক্তার ॥ কি জানি বাপু, বাইরে থেকে তো নেতাদের আমরা দেখি চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে। যেন আগুনের মত সব জ্বলছে।

চক্রবর্তী ॥ আগুনের মত জ্বলতে গেলেই ছাই হতেই হবে। নেতার জীবন হচ্ছে সেই ছাইয়ের গাদা। যাক গে সে কথা। এখন কি করা যায় বলো। সামনে আমার ইলেক্‌শন। ঘরে কুমির আর বাইরে বাঘ। আমি মারা যাবো যে। তোমাকে ডাকলাম। একটা বিহিত করতে, তা তুমি কিনা বোনের গুণগানেই মেতে রইলে। একটা কাজ করবে?

ডাক্তার ॥ কি?

চক্রবর্তী ॥ তুমি ওর মায়ের পেটের ভাই। এত বড় ডাক্তার। তুমি যদি একবার বলো—মাথা খারাপ হয়েছে—তবে খানিকটা রক্ষা। আমি ধরে বেঁধে রাঁচি পাঠিয়ে দি।

ডাক্তার ॥ রাঁচি পাঠিয়ে দেবে? তার মানে পাগলা গারদে?

চক্রবর্তী ॥ গারদ বলছো কেন? হাসপাতাল বলো। দস্তুর মতো চিকিৎসা হবে।

ডাক্তার ॥ কিন্তু তাতেও তো ওর মুখ বন্ধ করতে পারছো না।

চক্রবর্তী ॥ সে ছেড়ে দাও। পাগলে কিনা বলে! তার কথা কে ধরছে!

ডাক্তার ॥ উঃ! যে পাগল নয়, তাকে পাগল বলে চালানো! তুমি কি পারও!

চক্রবর্তী ।। এ ছাড়া আমার আর কোনো পথ নেই ডাক্তার।
তুমি আমাকে বাঁচাও ভাই। (ডাক্তারের হাত ধরিলেন)।

ডাক্তার ।। হাত ছাড়ো। ঐ যে সে আসছে।

(নখের উপর একাগ্র দৃষ্টি রাখিয়া অমলার প্রবেশ। শুচিস্মিতা মূর্তি। মহিমাময় ব্যক্তিত্ব। তিনি যেন অন্য জগতে রহিয়াছেন)

অমলা ।। দিনকে রাত করছে, রাতকে দিন করছে।

ডাক্তার ।। (চক্রবর্তীকে নিম্ন কণ্ঠে) শুনছো?

চক্রবর্তী ।। রাত দিন শুনছি।

অমলা ।। এর ফল ভালো হয় না। আমি বলছি এর ফল ভালো হবে না। পাপ আর পারা কখনো চাপা থাকে না। কাল অত রাতে সেই মেয়েটা আবার এসেছিল। যেন একটা আগুন। পোকার মত ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য তুমি ছটফট করছো। ঐ আগুন তোমাকে পুড়িয়ে মারবে। ওখান থেকে সরে এসো। এখনও বলছি সরে এসো।

চক্রবর্তী ।। (ডাক্তারকে) চল, আমরা এখান থেকে যাই।

ডাক্তার ।। না, দাঁড়াও। আমাকে সব শুনতে দাও।

অমলা ।। মেয়েটা কি চায়? তোমাকে হাত করতে চায়। কি বলছে? বলছে লোকগুলোকে বাঁচাও। কোন্ লোকগুলো? হ্যাঁ তাদেরও দেখছি। একটা কালো বাজার। একটা গুদাম ঘর। উঃ! কত শত চালের বস্তা। উঃ! আকাশ ছোঁয়া চড়া দরে বিক্রি হচ্ছে। দরজায় ঘা মারছে কে? তাইতো, এ যে পুলিশ!

চক্রবর্তী ।। চুপ।

অমলা ।। আ—হা-হা, কত লোক না খেতে পেয়ে মরছে। যারা তাদের মারছে তাদেরই বাঁচাতে বলছে মেয়েটা। উঃ মেয়েটা কি সুন্দর! সাপের মত সুন্দর। এ নাগপাশে তুমি ধরা দিয়ো না—দিয়ো না।

চক্রবর্তী ।। না না, এ অসহ্য।

অমলা ।। সত্যি এ অসহ্য। মানুষের জীবন নিয়ে এসব কি ছিনিমিনি খেলা। এ আমি দেখতে পারি না। এত পাপ আমি সইতে পারি না। আমি এখান থেকে চলে যাবো। এ পাপপুরীতে আমি থাকবো না। আমি পথে গিয়ে দাঁড়াবো। জনে জনে ডেকে বলবো, যদি বাঁচতে চাও এই পাপপুরী পুড়িয়ে দাও। একি! কে এসে আমার মুখ চেপে ধরছে!

জোর করে আমাকে গাড়িতে তুলছে! এ আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কি সুন্দর পথ! কি সুন্দর পাহাড়! কি সুন্দর শোভা! চিনেছি। হ্যাঁ, এখানে আমি আগে বেড়াতে এসেছি। এ-সেই রাঁচি—রাঁচি।

চক্রবর্তী॥ ডাক্তার দেখছো, ও নিজেই রাঁচি যেতে চাইছে।

ডাক্তার॥ তুমি একটি শয়তান। (অমলার কাছে ছুটিয়া গিয়া) আমি, তুই আমার সঙ্গে চল্, আমার বাড়ি।

অমলা॥ (অমলার স্বপ্ন যেন ভাঙিয়া গেল। বাস্তব জগতে ফিরিয়া) কি বলছো দাদা?

ডাক্তার॥ তোর অসুখ করেছে। আমি তোর চিকিৎসা করবো। চল আমার সঙ্গে, আমার বাড়ি।

চক্রবর্তী॥ (বজ্রকণ্ঠে) না।

অমলা॥ না। আমি রাঁচি যাবো। (হঠাৎ স্বামীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া) ওগো, তুমি আমাকে রাঁচি পাঠিয়ে দাও—রাঁচি পাঠিয়ে দাও। নইলে আমি আর বাঁচবো না।

ডাক্তার॥ ওঃ!

॥ যবনিকা ॥

দুর্গেশনন্দিনীর জন্ম

বনফুল

ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যসাগরেষু

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

॥ নাটকে উল্লিখিত ঐতিহাসিক তথ্য ॥

(জন্ম ২৬শে জুন, ১৮৩৮ , মৃত্যু ৮ই এপ্রিল ১৮৯৪)

১৮৫৮, ৬ই আগস্ট বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত হইয়া প্রথমেই যশোহরে যান এবং তথায় ডাক বিভাগের ইনস্‌পেক্‌টিং পোস্ট মাস্টার 'নীলদর্পণ'-প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন।

১৮৫৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হয়। তিনি ছুটি লইয়া বাড়ি আসেন এবং সুহৃদ্বর দীনবন্ধু মিত্রকে লইয়া পাত্রী দেখিতে আরম্ভ করেন।

১৮৬০ সালের জুন মাসে হালিসহরের বিখ্যাত চৌধুরী বংশের কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীর সহিত বিবাহ হয়। এই পত্নীকে তিনি কর্মস্থলে লইয়া যান।

১৮৬২ সালে খুলনায় অবস্থানকালে ২৪ বৎসর বয়সে 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা সুরু করেন।

১৮৬৪ সালের মার্চ মাসে বারুইপুরে (২৪ পরগণা) অবস্থান কালে 'দুর্গেশ-নন্দিনী' রচনা শেষ করেন। তৎপূর্বে ঐ অঞ্চলে সাইক্লোন হয়।

১৮৬৫ সালের মার্চ মাসে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রথম প্রকাশিত হয়। তখনও তিনি বারুইপুরেই ছিলেন। তিনি এই উপন্যাস জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন।

উপরোক্ত তথ্যাদি 'সাহিত্য সংসদ' প্রকাশিত 'বঙ্কিম রচনাবলী'র বঙ্কিম-পরিচিতি হইতে সংগৃহীত।

'দুর্গেশনন্দিনীর জন্ম' নাটকটিতে উল্লেখযোগ্য কাল্পনিক চরিত্র মাত্র একটি: জমিদার সামসুদ্দিন চৌধুরী। বলা বাহুল্য, তাঁহার কন্যার কাহিনীটিও নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত। এ সম্পর্কে ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

দুর্গেশনন্দিনীর জন্ম

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

[১৮৬২ সাল। খুলনা শহরে হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনের বৈঠকখানা। সন্ধ্যাকাল। বৈঠকখানার বহির্দ্বারে করাঘাত। অন্দর-দ্বার খুলিয়া বৈঠকখানায় ভৃত্য রামুর প্রবেশ। রামু অন্ধকার ঘর আলোকিত করিবার জন্য বাতিদানে আলো জ্বালিল। বহির্দ্বারে পুনরায় করাঘাত হওয়ায় সে বহির্দ্বার খুলিল। বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন এক আগন্তুক। তাঁহার বয়স বছর চল্লিশ হইবে। মুখে দীর্ঘ দাড়ি-গোঁফ। পরিধানে চুস্ত পাজামা মস্তকে একটি ফেজ।]

রামু ॥ কারে চাই ?

আগন্তুক ॥ বঙ্কিমবাবু বাড়ি আছেন ?

রামু ॥ তিনি আবার কে ?

আগন্তুক ॥ বাঃ, এটা বঙ্কিমবাবুর কুঠি নয় ?

রামু ॥ বঙ্কিমবাবু কে ?

আগন্তুক ॥ কি বিপদ ! শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—এই খুলনার হাকিম !

রামু ॥ ও ! আপনি সাহেবের কথা বলতিছেন ? হাকিম সাহেব ? তাই বলুন। বঙ্কিমবাবু বলতিছেন কেন ?

আগন্তুক ॥ আরে বাবা, বঙ্কিমবাবু—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই তোমার হাকিম সাহেব। বাড়ি আছেন ?

রামু ॥ সাহেব বাড়ি নেই।

আগন্তুক ॥ বাড়ি নেই ? আর কে আছেন ?

রামু ॥ মেমসাহেব আছেন, সাহেবের ছোট ভাই—ছোট সাহেব আছেন।

আগন্তুক ॥ সাহেব যখন নেই, ছোট সাহেবকেই না হয় খবর দাও। খুব জরুরী দরকার।

[অন্দর হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ]

পূর্ণচন্দ্র ॥ আপনি কাকে চান ?

আগন্তুক ॥ হাকিম সাহেবকে।

পূর্ণচন্দ্র ॥ তিনি তো ট্যুরে গেছেন।

আগন্তুক ॥ ট্যুরে গেছেন! এখন কি ফিরবেন তিনি ?

পূর্ণচন্দ্র ॥ কিছু ঠিক নেই। আজও ফিরতে পারেন, কালও ফিরতে পারেন। কবে কখন ফিরবেন, সে আমার জানা নেই।

আগন্তুক ॥ কিন্তু তাঁকে যে খুব জরুরী একটা খবর দিতে আমি এসেছিলাম। এসেছি অনেক দূর থেকে—বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে।

পূর্ণচন্দ্র ॥ কে আপনি ?

আগন্তুক ॥ আপনি কি তাঁর ছোট ভাই ?

পূর্ণচন্দ্র ॥ হ্যাঁ, আমার নাম শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু আপনি কে ? আপনার নাম কি ?

আগন্তুক ॥ নাম আমার জিজ্ঞাসা করবেন না। নাম আমি এই হাকিম সাহেবের কাছে বলবো। বঙ্কিমবাবুকে যখন পাচ্ছি না, আর আমিও যখন এখানে অপেক্ষা করতে পারছি না—কথাটা ভাবছি আপনাকেই বলে যাই। (উচ্চৈঃস্বরে অন্দরের উদ্দেশে) কথাটা আপনার বৌঠানেরও শোনা উচিত। খুব ভালো হয় যদি তিনি দরজার আড়াল থেকেও শোনেন।

পূর্ণচন্দ্র ॥ কি বিপদ! আপনি কে, আগে তাই বলুন।

আগন্তুক ॥ (চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া) আমি বঙ্কিমবাবুকে সাবধান করতে এসেছি। তাঁর বড বিপদ। আজই তাঁর প্রাণহানির সম্ভাবনা। খুলনায় এসে তিনি নীলকর সাহেবদের শায়েস্তা করেছেন। নীলকররা ক্ষেপে গিয়েছে। বঙ্কিমবাবুকে গুলি করে মারবার জন্য একটা ষডযন্ত্র হয়েছে।

পূর্ণচন্দ্র ॥ দাদা তা না জানেন এমন নয়।

আগন্তুক ॥ কিন্তু এটা কি জানেন, তাঁকে গুলি করে মারবার তারিখটা আজ ? আজ তো ১৮৬২ সালের পয়লা নবেম্বর।

পূর্ণচন্দ্র ॥ হ্যাঁ, আজ আঠারো শ' বাষট্টি সালের পয়লা নবেম্বর। কিন্তু তাতে কি ?

আগন্তুক ॥ আজই তাঁকে গুলি করে মারবার দিন। এতক্ষণ বেঁচে আছেন কিনা—

পূর্ণচন্দ্র ॥ কে আপনি ?

আগন্তুক ॥ আমি নাম বলবো না। তাতে আমার সমূহ বিপদ। আমি এসেছি ছদ্মবেশে—এই দেখুন।

[নিজের কৃত্রিম দাড়ি অপসারিত করিয়া দেখাইয়া পুনরায় উহা পরিয়া লইলেন।]

পূর্ণচন্দ্র ॥ মনে হচ্ছে আপনি হিন্দু।

আগন্তুক ॥ শুধু হিন্দু নই, ব্রাহ্মণ। আমি নীলকর সাহেবদের অধীনে চাকরি করি। বড চাকরিই করি। চাকরি করলেও কিন্তু নীলকর চাষীদের ওপর নীলকর সাহেবেরা যে অমানুষিক অত্যাচার করেছে, এখনো করছে —মনেপ্রাণে তা সইতে পারি না। দেখলাম, বঙ্কিমবাবু হাকিম হয়ে এখানে এসে কি অদ্ভুত সাহসে মরেল, লাইটফুট আর হিলির মত দুর্দান্ত নীলকর সাহেবদেরও ঢিট করলেন। দেখলাম, দেখে অবাক হলাম।

পূর্ণচন্দ্র ॥ তা সবাই অবাক হয়েছে। দাদার কাছে শুনেছি মরলে আর লাইটফুট সাহেব পালিয়ে গেছে বিলেতে। আর ছদ্মনামে বিলেতে পালাতে গিয়ে হিলি সাহেব পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে বোম্বেতে। সে এখন হাজতে। তার বিচার হবে। নীলকরদের বিষদাঁত তো ভেঙে গেছে। তবে আর দাদার বিপদটা কোথায ?

আগন্তুক ॥ কিন্তু আরো তো নীলকর সাহেব সব রয়েছে। তারা এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে—ক্ষেপে গেছে। তারাই ষড়যন্ত্র করে ঠিক করেছে তাদের চরম শত্রু নিপাত করবে। কাল রাত্রে আমি হঠাৎ জানতে পারি বঙ্কিমবাবুকে গুলি করে মারবার যে তারিখটি ঠিক হয়েছে সে তারিখটি হচ্ছে আজ। আজকের এই রাতটি !

পূর্ণচন্দ্র ॥ আপনি বসুন।

আগন্তুক ॥ না, আমার বসবার সময় নেই। এখানে আর অপেক্ষা করলে আমিই ধরা পড়ে যাবো। যদি এতক্ষণও কাজটি হাসিল না হয়ে থাকে বন্দুক হাতে আততায়ী হয়তো এতক্ষণ এসে গেছে এই বাড়ির আশেপাশে। আপনার দাদা যদি আজ রাত্রে বাড়ি না ফেরেন, আমার মনে হচ্ছে, সেইটিই হবে তাঁর মঙ্গল। আমি চলি। দরজার আড়ালে

চুড়ির শব্দ শুনলাম। তবে বোধ হয় আপনার বৌঠানও আমার কথা আড়াল থেকে শুনেছেন। আপনারা বঙ্কিমবাবুকে যেমন করে হোক কিছুদিনের জন্য সরিয়ে নিয়ে যান কলকাতায়। বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচুন, তবেই নীলচাষীরা বাঁচবে। চললাম—এখনি আমাকে অন্ধকারে মিশে যেতে হবে। নমস্কার। না না, আদাপ্‌।

[আগন্তুক ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অভিভূত পূর্ণচন্দ্র ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ভিতর হইতে বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই দেখেন বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী ভয়ে কাঁপিতেছেন।]

রাজলক্ষ্মী ॥ কি হবে ঠাকুরপো?

পূর্ণচন্দ্র ॥ তুমি বুঝি সব শুনেছো?

রাজলক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ, সবই তো শুনলাম। লোকটি বলে গেল তোমার দাদা আজ যদি বাড়ি না ফেরেন, তবেই রক্ষা। কিন্তু ফিরতেও তো পারেন।

পূর্ণচন্দ্র ॥ তা অবশ্য পারেন। কিন্তু তিনি ফিরলেও একা ফিরবেন বলে মনে হয় না। যাবার সময় দাদা আমাকে বলে গিয়েছেন দীনবন্ধু মিত্র মশাইকে সঙ্গে আনতে পারেন।

রাজলক্ষ্মী ॥ কই, আমাকে তো এসব বলে যাননি!

পূর্ণচন্দ্র। কিন্তু আমাকে বলে গেছেন।

রাজলক্ষ্মী ॥ আমাকে বলেননি কেন, তা বুঝেছি।

পূর্ণচন্দ্র ॥ কি?

রাজলক্ষ্মী ॥ মিত্র মশায়ের শ্বশুরবাড়ি আমার বাপের বাড়ির পাশের গ্রামেই।

পূর্ণচন্দ্র ॥ হ্যাঁ, সেই সুবাদেই তো তুমি ওঁকে মেসোমশাই বলো।

রাজলক্ষ্মী ॥ কিছুদিন আগে তোমার দাদা আমাকে বললেন, আজ তোমাকে একটা 'নীলদর্পণ' উপহার দেব। আমি বললাম, না না, আয়না আবার নীল কেন, দেবেই যদি তবে শ্বেতচন্দনকাঠের ফ্রেমে দিও।

পূর্ণচন্দ্র ॥ সর্বনাশ! 'নীলদর্পণ' যে দীনবন্ধু মিত্রের অতবড় নামকরা নাটক —এ বুঝি তুমি তখন জানতে না বৌঠান?

রাজলক্ষ্মী ॥ না, ঠাকুরপো।

পূর্ণচন্দ্র ॥ দাদা বুঝি চটে গেলেন?

রাজলক্ষ্মী ॥ তা গেলেন।

পূর্ণচন্দ্র ॥ তা আর যাবেন না! দীনবন্ধু মিত্র বয়সে বড় হলে হবে কি, দাদার প্রাণের বন্ধু। তিনি ডাক বিভাগের বড়কর্তা বলে নন, তোমার মেসোমশাই বলেও নন, বন্ধু হয়েছেন সাহিত্যিক বলে—বিশেষ ঐ 'নীলদপণ' নাটক লিখে; আর তুমি কিনা সেই খবরটাই রাখো না। চটবেন না?

রাজলক্ষ্মী ॥ চটবেন আবার না! আমাকে বললেন, যতদিন 'নীলদর্পণ' বই না পড়বে ততদিন দীনবন্ধুবাবুর খবর তুমি পাবে না। মেসোমশাই বলেও না।

পূর্ণচন্দ্র ॥ তা 'নীলদর্পণ' এর মধ্যে পড়ে ফেলেছো তো?

রাজলক্ষ্মী ॥ মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, কি করে আর পড়ে ফেলি বল!

পূর্ণচন্দ্র ॥ তুমি আবার মুখ্যু। তোমার লেখাপড়া দেখে সেজদাই অবাক! পড়ে ফেলেছো তো 'নীলদর্পণ'?

রাজলক্ষ্মী ॥ না পড়ে রক্ষে ছিলো?

পূর্ণচন্দ্র ॥ কেমন লাগলো?

রাজলক্ষ্মী ॥ ও বই পড়লে যাকে বলে রোমাঞ্চ হয়। উঃ! নীলকরদের কি অত্যাচার। আর আমারও কপাল দেখ, বিয়ে হতে না হতেই এসে পড়েছি সেই নীলকরদেরই রাজ্যে। ওরা কি মানুষ? যত সব শয়তান।

পূর্ণচন্দ্র ॥ সত্যি। কিন্তু আজ আবার ঐ ভদ্রলোক যা বলে গেলেন—এখন মিত্র মশাইকে তাঁর 'নীলদর্পণ' এর দ্বিতীয় ভাগ না লিখতে হয়।

রাজলক্ষ্মী ॥ আচ্ছা, তোমার সেজদা তো গেছেন ট্যুরে। নৌকো করে গেছেন। মেসোমশাইকে তিনি পাবেন কোথায়?

পূর্ণচন্দ্র ॥ বৌঠান, গাই-বাছুরে যদি ভাব থাকে, বনে গিয়েও দুধ দেয়। চিঠি চালাচালি করে হয়তো ঠিক হয়েছে দুই বন্ধুতে নৌ-বিহার হবে কবে আর কোথায়।

রাজলক্ষ্মী ॥ তবেই দেখ ঠাকুরপো, এখানে ফিরে এলেও বিপদ, আবার না এলেও বিপদ। এ বরং তবু বাড়ি, তুমি আছো, আমি আছি।

পূর্ণচন্দ্র ॥ বটেই তো। এখানে যে মহা সাহায্যটা তুমি করতে পারতে, ওখানে তিনি তা পাবেন না বটে।

রাজলক্ষ্মী ॥ মনে হচ্ছে ঠাট্টা করলে ঠাকুরপো। এখানে থাকলে কি আমি কোন সাহায্যই করতে পারতাম না?

পূর্ণচন্দ্র ॥ না না, খুব চেঁচিয়ে কান্নাকাটি করাও একটা সাহায্য। তাতে পাড়ার লোক জড়ো হবে ভেবে চোর-ডাকাতরা অনেক সময় পালিয়ে যায় বৈকি, বৌঠান!

রাজলক্ষ্মী ॥ আমি বুঝি শুধু কান্নাকাটি করতেই জানি? তোমার আগের বৌঠান বুঝি লড়াই করতেন?

পূর্ণচন্দ্র ॥ না না বৌঠান, তিনি জানতেন শুধু হাসতে। সেজদা এগারো বছর বয়সে পাঁচ বছরের মেয়ে মোহিনী দেবীকে বিয়ে করে ঘরে আনতেই আমাদের বাড়িটা যেন হাসিতে ভরে গেল। ষোলো বছর বয়সে যখন জ্বরে আমাদের সেই বৌঠান মারা গেলেন কেড়ে নিয়ে গেলেন সবার মুখের হাসি, কিন্তু নিজের হাসিটুকু লেগে ছিল তখনো তাঁর মুখে।

রাজলক্ষ্মী ॥ তিনি জানতেন শুধু হাসতে আর আমি ঝি শুধু কাঁদি? আনলে কেন আমাকে তোমাদের ঘরে?

পূর্ণচন্দ্র ॥ সেজদা তো তোমাকে দেখেশুনেই এনেছেন। নিশ্চয়ই এমন কিছু দেখেছেন—এমন কিছু পেয়েছেন যার তুলনা নেই বৌঠান!

রাজলক্ষ্মী ॥ একটা ঘোড়ার গাড়ির শব্দ পাচ্ছি না?

পূর্ণচন্দ্র ॥ হ্যাঁ, তাই তো!

রাজলক্ষ্মী ॥ তোমার দাদা এলেন।

[পূর্ণচন্দ্র ছুটিয়া জানালায় গিয়া দেখিলেন]

পূর্ণচন্দ্র ॥ হ্যাঁ, তাই তো! দাদাকে তুমি ধ্যান কর নাকি বৌঠান, যে এমন করে দেখতে পাও?

[পূর্ণ ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। রাজলক্ষ্মী ঠাকুরের উদ্দেশে কি যেন প্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিলেন। বঙ্কিম ও দীনবন্ধু মিত্রকে লইয়া পূর্ণচন্দ্রের পুনঃপ্রবেশ।]

বঙ্কিম ॥ (পূর্ণচন্দ্রকে) দীনুদার মালপত্রগুলো দেউড়িতে তুলতে বলো—গাড়োয়ানকে ভাড়া মিটিয়ে দাও।

দীনবন্ধু ॥ না না বঙ্কিম, এখনি আমার না গিয়ে উপায় নেই। পূর্ণ, গাড়োয়ানকে দাঁড়াতে বলো। ঐ গাড়িতেই আমি ফিরে যাবো।

পূর্ণ ॥ সেজদা!

বঙ্কিম ॥ একবারের বেশি অনুরোধ তোমার সেজদা কখনো কাউকে করেছে? যাও।

[পূর্ণচন্দ্র বাহিরে চলিয়া গেলেন। রাজলক্ষ্মী গলায় আঁচল দিয়া দীনবন্ধুকে নমস্কার করিতে আসিলে]

বঙ্কিম ॥ (রাজলক্ষ্মীকে) না না, দাঁড়াও। কাকে নমস্কার করতে যাচ্ছো?

রাজলক্ষ্মী ॥ (হাসিয়া) আমার নীলদর্পণ-মেসোমশাইকে।

বঙ্কিম ॥ নীলদর্পণ তবে নীল আয়না নয়?

রাজলক্ষ্মী ॥ বাঃ বাঃ! হ্যাঁ এইবার গিয়ে তুমি নমস্কার কেন, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর।

দীনবন্ধু ॥ না না, একি! ব্যাপার কি?

বঙ্কিম ॥ ব্যাপারটা প্রাইভেট। না না, প্রণাম করতে দাও। তুমি দীনের বন্ধু, আমার মিত্র—তোমাকে প্রণাম করবে না তো প্রণাম করবে কাকে? হওনা কেন তুমি কায়স্থ!

দীনবন্ধু ॥ তর্কে আমি তোমার সঙ্গে পারি না বাঁকা চাঁদ। (রাজলক্ষ্মীকে) প্রণাম করবি কর কিন্তু চটপট চা করে দে তো দেখি! আমি এখনি চলে যাবো।

রাজলক্ষ্মী ॥ না মেসোমশাই, না। আজকের রাতটা আপনাকে থাকতেই হবে।

বঙ্কিম ॥ না, উনি থাকতে পারবেন না। জরুরী কাজে এখনি ওঁকে চলে যেতে হবে। তুমি চপপট চা করে আনো লক্ষ্মী। আসবার ওর কোনো কথাই ছিল না এখানে। এসেছেন শুধু তোমাকে দেখে যেতে।

রাজলক্ষ্মী ॥ কিন্তু—

দীনবন্ধু ॥ আমি আবার শিগ্‌গীরই আসছি মা। সেবার তোমার এখানে দু'দিন থেকে যাবো।

রাজলক্ষ্মী ॥ কিন্তু আজ—

বঙ্কিম ॥ (অধীর হইয়া, একটু ক্রোধে) চা।

[রাজলক্ষ্মী নতমুখে তড়িৎগতিতে চলিয়া গেলেন।]

বঙ্কিম ॥ (হস্তস্থিত ইংরেজী সংস্করণ নীলদর্পণ দেখাইয়া) নীলদর্পণের এই অনুবাদ কলিকাতায় প্রথম প্রকাশ হয় ১৮৬১ সালে। এপ্রিল কি মে মাসে।

দীনবন্ধু ॥ মাসটা আমারও ঠিক মনে পড়ছে না—তবে হ্যাঁ, গেল বছর।

বঙ্কিম ॥ কি আনন্দ হচ্ছে দেখে যে, এক বছরের মধ্যেই ঐ ইংরেজী অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশ হলো।

দীনবন্ধু ॥ হ্যাঁ, এক বছরের মধ্যেই বাসাংসি জীর্ণানি— [বাহির হইতে পূর্ণচন্দ্রর প্রবেশ]

বঙ্কিম ॥ (উচ্চহাস্য করিয়া) যা বলেছো—বাসাংসি জীর্ণানি—

পূর্ণচন্দ্র ॥ সেজদা!

বঙ্কিম ॥ তবে এ জন্মান্তর একেবারে খাস লণ্ডনে। প্রকাশকও খাস ইংরেজ—সিম্পকিন মার্সাল অ্যাণ্ড কোং।

পূর্ণচন্দ্র ॥ সেজদা! একটা কথা।

বঙ্কিম ॥ নাচতে পারো পূর্ণ, আনন্দে নাচতে পারো।

পূর্ণচন্দ্র ॥ নাচবো! কেন?

বঙ্কিম ॥ চা।

পূর্ণচন্দ্র ॥ হ্যাঁ চা আসছে কিন্তু বিশেষ একটা কথা ছিল। একজন ছদ্মবেশী ভদ্রলোক—

বঙ্কিম ॥ ছদ্মবেশী না, ছদ্মনামী। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হলো 'নীলদর্পণং নাটকম্'। রচয়িতার নামের জায়গায় দেখা গেল 'নীল-কর-বিষধর-দংশন কাতর-প্রজানিকর ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম্'। গোটা বাংলা দেশ ভেবে ঠিক করতে পারে না এই ধুরন্ধর পথিকটি কে! তুমিই কি জানতে পূর্ণ?

পূর্ণচন্দ্র ॥ তখন জানতাম না, পরে জানলাম (দীনবন্ধুকে দেখাইয়া) ইনি।

বঙ্কিম ॥ হ্যাঁ ইনি। দীনের বন্ধু আর আমার মিত্র—দীনবন্ধু মিত্র। চা—

পূর্ণচন্দ্র ॥ কিন্তু সেজদা—

বঙ্কিম ॥ আর কিন্তু টিন্তু নেই। এবার একেবারে সিম্পকিন মার্সাল অ্যাণ্ড কোং। এই দেখ, আছো কোথায়—এই দেখ! বিলেত থেকে যেই হাতে এসেছে অমনি সুন্দরবনে ছুটে এসে আমার হাতে দিয়ে গেলেন। নাচতে পারো পূর্ণ—নাচতে পারো।

দীনবন্ধু ॥ তুমি না নেচে ওকে নাচাচ্ছো কেন?

বঙ্কিম ॥ আমিও নাচছি। মনে মনে নাচছি। ওর বৌঠানের ভয়ে। চা—

পূর্ণচন্দ্র ॥ সেজদা, খুব সাংঘাতিক একটা কথা—

বঙ্কিম। সাংঘাতিক নিশ্চয়। ইংরেজী অনুবাদটা করেছেন মাইকেল মধুসূদন

দত্ত। হাইকোর্টের কেরাণী। খাস গভর্নমেণ্টের চাকর। সাহসটা দেখ।

পূর্ণচন্দ্র ॥ তবে বলবো সেজদা, তাঁর চেয়েও বেশি সাহস (দীনবন্ধুকে দেখাইয়া) ওঁর। কারণ, তোমার মুখেই শুনেছি, মূল নাটকটি যখন উনি লেখেন, তখন উনি গভর্নমেণ্টের ডাক বিভাগের ইটস্‌পেকটিং পোস্ট মাস্টার— অতবড কর্তা। গভর্নমেণ্টের কাছে অনুবাদক ক্ষমা পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু মূল লেখক?

দীনবন্ধু ॥ ক্ষমা কেউই পায়নি পূর্ণ। বেনামীতে কাজ হয়েছিল বলে কাঠ-গড়ায় আমাদের দু'জনকে দাঁড়াতে হয়নি বটে, ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় ডিপার্টমেণ্টাল লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে দু'জনকেই। কিন্তু সেটা আমরা হাসিমুখে সহ্য কববো পাদরী লং সাহেবের মুখ চেয়ে। The long and short of it is this.

বঙ্কিম ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—

পূর্ণচন্দ্র ॥ আমিও সেটা খুবই স্বীকার কবি। ব্রিটিশ মিশনারী সাহেব হয়ে নিজের জাতভাই নীলকরদেব এই অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়ে—তা এদেশে আব বিলেতে প্রকাশ করে তিনি ঘোষণা করেছেন, মানবতার কোনো জাত নেই। বিচারে তাঁর হাজার টাকা জরিমানা আর সাধারণ কয়েদীর মত এক মাস জেল হয়েছে বটে কিন্তু তাতে তিনি গোটা ভারতবাসীর নমস্য হয়েছেন।

দীনবন্ধু ॥ নমস্য বলো না পূর্ণ। জাত যাবার ভয় রাখো না? বলো— Hats off. টুপি খুলে সম্মান করো।

বঙ্কিম ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—ঠিক বলেছো বন্ধু।

পূর্ণচন্দ্র ॥ কিন্তু দুঃখ এই, গোটা পৃথিবীতে নীলকরদের কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও তাদের লজ্জা হয়নি এখনো।

বঙ্কিম ॥ কিন্তু তাদের বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছি আমি।

পূর্ণচন্দ্র ॥ পারোনি সেজদা; তারা আরো মরিয়া হয়ে উঠেছে। মরলে আর লাইটফুট বিলেতে পালালেও হিলি সাহেবের এখনো সাজা হয়নি।

বঙ্কিম ॥ হাজতে পচছে। সামনের মাসেই তার বিচার হবে। নরহত্যার বিচার।

পূর্ণচন্দ্র ॥ কিন্তু এখনো অনেক মরলে, অনেক লাইটফুট, অনেক হিলি এই জেলাতেই নির্বিবাদে যা খুশি তাই করছে।

বঙ্কিম ॥ (অসহিষ্ণু হইয়া) সে আমি দেখছি। তুমি এইবার দেখ দেখি, চা আসছে না কেন? আর রামু ব্যাটা কি মারা গেছে? তামাক এলো না এখনো?

পূর্ণচন্দ্র ॥ একটা বিশেষ জরুরী কথা ছিল সেজদা।

বঙ্কিম ॥ আমি বলছি পূর্ণ চা আর তামাকের চেয়ে বেশি জরুরী আর কিছু নয়। তুমি না গেলে আমাকেই উঠতে হচ্ছে।

পূর্ণচন্দ্র ॥ না না, আমি যাচ্ছি সেজদা।

বঙ্কিম। বইটা আমার পড়বার টেবিলে রেখে দাও।

[পূর্ণচন্দ্র অন্দরে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে টেবিলের উপর রক্ষিত ইংরেজী নীলদর্পণখানি লইয়া গেলেন। রামু তামাক লইয়া আসিয়া উহা পরিবেশন করিয়া চলিয়া গেল।]

দীনবন্ধু ॥ তুমি দেখছি একটি ক্ষুদে বাদশা।

বঙ্কিম ॥ যারা চাকরি করে, বাদশাগিরিটা তাদের বাড়িতেই চলে।

দীনবন্ধু ॥ আমার কিন্তু বাড়িতেও চলে না।

বঙ্কিম ॥ ওটা তোমার মেজাজের দোষ।

দীনবন্ধু ॥ (হাসিয়া) যা বলেছো। তা জাঁহাপনা, নতুন বেগমটিকে কেমন লাগছে?

বঙ্কিম ॥ কেমন লাগছে? তার বর্ণনা পাবে আমার বইয়ে—'দুর্গেশনন্দিনী'তে। শেষ হোক—যখন পড়ে শোনাবো, তখন দেখবে।

দীনবন্ধু ॥ যদি পড়ে শোনাও, তবে না হয় আজ থেকে যাই।

বঙ্কিম ॥ না না, শেষ না করে আর কাউকে পড়ে শোনাচ্ছি না।

দীনবন্ধু ॥ শুনিয়েছিলে নাকি কাউকে?

বঙ্কিম ॥ আমার অসমাপ্ত এই রচনার প্রথম দুই শ্রোতা কে জানো?

দীনবন্ধু ॥ কে?

বঙ্কিম ॥ ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

দীনবন্ধু ॥ বড়দা। আর একজন?

বঙ্কিম ॥ ডেপুটি কালেক্টর শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দীনবন্ধু ॥ মেজদা।

বঙ্কিম ॥ হ্যাঁ।

দীনবন্ধু ॥ কি বললেন তাঁরা?

বঙ্কিম ॥ খুশী হননি। বললেন, প্রকাশযোগ্য নয়।

দীনবন্ধু ॥ কেন নয়—বললেন?

বঙ্কিম ॥ হ্যাঁ, তা বলেছেন। খুব যে অন্যায় বলেছেন তাও নয়। ভেবেছিলাম থাক, আর এগোবো না।

দীনবন্ধু ॥ না না, সেকি! তুমি লিখবে না তো কে লিখবে? তুমি দেশের প্রথম গ্রাজুয়েট। ইংরেজী সাহিত্যে, ইতিহাসে, সংস্কৃতে তুমি সমান পণ্ডিত। তুমি লিখবে না তো কে লিখবে?

বঙ্কিম ॥ না না, আমি লিখছি। আমি আবার লেখা শুরু করেছি। দাদাদের কথায় ঘাবড়ে গিয়েছিলাম বটে কিন্তু ভেবে দেখলাম—কি ভেবে দেখলাম বলো তো?

দীনবন্ধু ॥ কি?

বঙ্কিম ॥ অসহ্য, অসহ্য।

দীনবন্ধু ॥ কি অসহ্য হে?

বঙ্কিম ॥ ইংরেজী সাহিত্য পড়ে গা জ্বলে যায়।

দীনবন্ধু ॥ সেকি! কেন বল তো?

বঙ্কিম ॥ ইংরেজী উপন্যাস-সাহিত্য কত উঁচুতে উঠেছে, সে তুলনায় আমাদের উপন্যাস-সাহিত্য কত নীচুতে নেমে রয়েছে। ভাবতে গেলেই আমার গা জ্বলে যায়। 'বিজয় বসন্ত', 'কামিনীকুমার', সেকেলে 'কাদম্বরী' ধরনের উপন্যাস, 'হংসরূপী রাজপুত্র','চকমকির বাক্স'—এমনি কয়েকটা হালকা ছোট গল্প আর আরব্য উপন্যাস—এমনি কয়েকটা উপকথা—এই হলো গিয়ে আমাদের কথাসাহিত্য। এক যা 'আলালের ঘরের দুলাল' একটু নতুন ভাব এনেছে। কিন্তু ওখানেই শেষ।

দীনবন্ধু ॥ তুমি লেখ, তুমি পারবে। তোমার এত পড়াশোনা, তোমার এমন শিক্ষা আর পাণ্ডিত্য—

বঙ্কিম ॥ দীনের এই মাথাটি খেয়ো না বন্ধু, হে দীনবন্ধু! ঐ চা এসেছে, খাও।

[রাজলক্ষ্মী চা এবং প্রচুর জলপান আনিয়া পরিবেশন করিতে লাগিলেন।]

দীনবন্ধু ॥ দেরিটা কেন হচ্ছিলো বুঝলে বঙ্কিম ?

বঙ্কিম ॥ অ্যাঁ, দেরি ? ঐ তুই দাদার জন্য। ওদের কথায় ঘাবড়ে গিয়ে আর এগুইনি। কিন্তু ঠিক করেছি, এবার আমি শেষ করবোই।

দীনবন্ধু ॥ লিখে শেষ করবার আগে খেয়ে শেষ করো।

বঙ্কিম ॥ ও হ্যাঁ, তাও তো বটে। বাঃ বেশ হয়েছে তো। (দীনবন্ধুকে) তা, তুমি যে কিছু বলছো না ?

দীনবন্ধু ॥ আমি আর কি বলবো, ও তো আমাদেরই মেয়ে।

বঙ্কিম ॥ মেয়ে দেখাতে নিয়ে গিয়ে তোমরা যেদিন ওকে আমায় দেখালে সেদিন ওকে দেখামাত্র একটা নাম আমার মনে এল—'তিলোত্তমা'।

রাজলক্ষ্মী ॥ আঃ !

বঙ্কিম ॥ (রাজলক্ষ্মীকে) তুমি নও, তুমি নও। আমার দুর্গেশনন্দিনী। এখন বইটা লিখতে কেন এত প্রেরণা পাচ্ছি জানো দীনু ভাই ?

রাজলক্ষ্মী ॥ আমি আসি মেসোমশাই।

[সলজ্জহাস্যে ত্বরিতপদে অন্দরে চলিয়া গেলেন।]

বঙ্কিম ॥ ভাবলো, আমি বুঝি ওর কথাই বলছি।

দীনবন্ধু ॥ তাই তো বলছিলে।

বঙ্কিম ॥ না না, আমি কী থেকে দুর্গেশনন্দিনী লিখতে এখন এত প্রেরণা পাচ্ছি তাই বলছিলাম।

দীনবন্ধু ॥ কী থেকে ?

বঙ্কিম ॥ এখানকার নীলকরদের সঙ্গে আমার যে লড়াই চলছে, তা থেকে। আমার দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসটাই বিরাট একটা লড়াইএর ইতিহাস। মোগল-পাঠানের লড়াই।

দীনবন্ধু ॥ তুমি একসময় বলেছিলে বটে।

বঙ্কিম ॥ এই লড়াইয়ের উপন্যাস লিখতে এখন প্রেরণা যোগাচ্ছে কে জানো ?

দীনবন্ধু ॥ সে তো পালিয়ে গেল।

বঙ্কিম ॥ না না, পালিয়েছে মরেল আর লাইটফুট। পাঠানরাও পালিয়েছিল। কিন্তু একদিন রাতে মোগলবন্ধু বীরেন্দ্রসিংহের গড়মান্দারণ দুর্গে মোগল সেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ এসেছে যখন অভিসারে, তাকে অনুসরণ করে পাঠান সেনাপতি ওসমান একই গুপ্তপথে দুর্গে ঢুকে অতর্কিতে আক্রমণ করলো জগৎসিংহকে। কল্পনা করে যে লড়াইয়ের

কথা লিখতে হচ্ছিল সেই লড়াই এখন দেখছি স্বচক্ষে। নীলকরদের সঙ্গে প্রজাদের। সেই লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছি আমিও। রাত জেগে যখন বসে বসে লিখি তখন কি মনে হয় জানো?

দীনবন্ধু ॥ কি?

বঙ্কিম ॥ লড়াইয়ের নায়ক যেন আমি। সে যে কি উন্মাদনা—সে যে কি—(আত্মস্থ হইয়া) একি! খাচ্ছো না যে?

দীনবন্ধু ॥ খাওয়ার লড়াইয়ে আমি হেরে গেছি বন্ধু, এর বেশি আর পারছি না! (ঘড়ি দেখিয়া) এখন আমাকে উঠতে হয়। লেখা চালিয়ে যাও বাঁকা। তোমার যে তন্ময়তা দেখে গেলাম, তাতে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করে যাচ্ছি—তোমার এই 'দুর্গেশনন্দিনী'র জয়জয়কার হবে। (অন্দরের দিকে তাকাইয়া) কই মা-লক্ষ্মী, আমি যাচ্ছি।

[রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ ও দীনবন্ধুকে প্রণাম]

দীনবন্ধু ॥ আসবো মা, আবার আসবো।

রাজলক্ষ্মী ॥ আজকের রাতটা কি কোনমতেই থেকে যেতে পারেন না, মেসোমসাই?

[দীনবন্ধু বঙ্কিমের দিকে বিপন্নভাবে তাকাইলেন।]

বঙ্কিম ॥ (রাজলক্ষ্মীকে) না, পারেন না। সরকারী কর্মচারীদের ট্যুর-প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করতে হয়।

[পূর্ণচন্দ্র অন্দর হইতে প্রবেশ করিলেন]

পূর্ণচন্দ্র ॥ (দীনবন্ধুকে) একি আপনি চলে যাচ্ছেন? একটা কথা অনেকদিন থেকে বলব বলব ভাবছিলাম, আজ বলবোই। স্টো'র Uncle Tom's Cabin বইটা আমেরিকার নিগ্রোদের দাসত্ব মোচনে যে সাহায্য করেছিল, আপনার 'নীলদর্পণ' তেমনি সাহায্য করছে নীলকর সাহেবদের হাত থেকে বাংলার চাষীদের মুক্ত করতে।

বঙ্কিম ॥ একথা এখন সবাই বলছে পূর্ণ। আমি বলবো, তার চেয়েও বেশি সাহায্য করছে। 'নীলদর্পণ' বের হতেই মানব-সভ্যতার টনক নড়েছে। কিন্তু এবার তুমি ওঁকে একটু সাহায্য কর তো! চলো, ওঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।

দীনবন্ধু ॥ না না, তুমি থাকো বঙ্কিম। ট্যুরের জামা কাপড ছাডো। এত ফর্মালিটি আমি পছন্দ করি না।

বঙ্কিম ॥ (হাসিয়া) আদেশ শিরোধার্য বন্ধু।

পূর্ণ ॥ কিন্তু সেজদা, আমি বলছিলাম কি, আজকের রাতটা উনি যদি থেকে যেতেন—

বঙ্কিম ॥ (রোষকষায়িত লোচনে পূর্ণের প্রতি) না। উনি থাকবেন না।

দীনবন্ধু ॥ এসো পূর্ণ, এসো।

[পূর্ণচন্দ্র ও দীনবন্ধু চলিয়া গেলেন। অপস্রিয়মান দীনবন্ধুব দিকে তাকাইয়া স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিলেন—]

বঙ্কিম ॥ "—মনে করি কাঁদিব না রব অহঙ্কারে।
আপনি নয়ন তবু ঝরে বারে বারে ॥
গোপনে কাঁদিবে প্রাণ সকলি আঁধাব।
জীবন একই স্রোতে চলিবে আমার ॥"
(স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া) চোখে জল কেন ?

রাজলক্ষ্মী ॥ মাথার উপর কত বড বিপদ জানো ?

বঙ্কিম ॥ ফিরে এসে যখন তোমায় পেয়েছি, বিপদ আবাব কি ?

রাজলক্ষ্মী ॥ এতক্ষণ ধরে বলতে চাইছি, কিন্তু বলতে দিলে কই ?

[পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ]

পূর্ণচন্দ্র ॥ সেজদা ! আজ সাংঘাতিক বিপদ।

বঙ্কিম ॥ (হাসিয়া) ঘামে ভেজা জামা কাপডের চেয়ে বড বিপদ আর নেই। ঘাম গায়ে বসে গেলে নিউমোনিয়া হতে পারে, জানো ? তোমরা বসো। নিউমোনিয়ার বিপদটা আগে কাটিয়ে আসি।

[বঙ্কিমের অন্দবে প্রস্থান]

রাজলক্ষ্মী ॥ দেখছো তো ঠাকুরপো, এই লোককে নিয়ে আমাকে ঘর করতে হয়।

পূর্ণচন্দ্র ॥ বৌঠান, তুমি দেখছো এই দু' বছর, আমি দেখছি বিশ বছর।

রাজলক্ষ্মী ॥ ভদ্রলোক বলে গেলেন, আজ রাত্রেই মারতে আসবে ?

পূর্ণচন্দ্র ॥ তাই তো বললেন, আজ নাকি মারবার তারিখ। তা তুমি ভেব

না বৌঠান। দাদা একাই একশ'। তার ওপর আমি রয়েছি, রামু রয়েছে, দ্বারোয়ানকে বলে রেখেছি, আমাদের না বলে আর যেন কাউকে কুঠিতে ঢুকতে না দেয়। না না, বৌঠান, দাদা যখন নিজের দুর্গে এসে পৌঁচেছেন, মোগল-পাঠানই হোক, আর নীলকরই হোক, কাউকে ভয় করি না।

রাজলক্ষ্মী ॥ তোমাব সেজদা 'দুর্গেশনন্দিনী' বই লিখেছেন বলেই যদি এ বাড়িটা দুর্গ হয়, তবে আর ভাবনা ছিল কি?

পূর্ণচন্দ্র ॥ শুধু দুর্গই নয়, দুর্গেশনন্দিনীও রয়েছেন।

রাজলক্ষ্মী ॥ ও বাবা, তিনি আবার কে?

পূর্ণচন্দ্র ॥ কেন, তুমি। দাদা দুর্গেশনন্দিনীতে তিলোত্তমাব যা রূপ বর্ণনা করেছেন—

রাজলক্ষ্মী ॥ ও, লুকিয়ে লুকিয়ে তবে তুমি পাণ্ডুলিপিটা পড়েছো।

পূর্ণচন্দ্র ॥ দোহাই বৌঠান, দাদাকে বলো না যেন। তবে আর আমার রক্ষে থাকবে না।

[বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবেশ]

বঙ্কিম ॥ কার রক্ষে থাকবে না?

রাজলক্ষ্মী ॥ সেইটাই তো এতক্ষণ ধরে তোমাকে বলতে চাইছি। কিন্তু বলতে দিচ্ছ কই?

বঙ্কিম ॥ বেশ এইবার কি বলবে বল। কিন্তু তার আগে চাই চা আর তামাক।

পূর্ণচন্দ্র ॥ বৌঠান! তুমি দেখ। বলবার এ সুযোগ হারালে আর হয়তো সুযোগ পাবোই না।

রাজলক্ষ্মী ॥ বেশ। তুমি কিন্তু সব ব'লো। কিচ্ছু বাদ দিয়ো না।

[রাজলক্ষ্মী অন্দরে চলিয়া গেলেন।]

পূর্ণচন্দ্র ॥ তুমি আর মিত্র মশাই এখানে ফেরবার কিছু আগে এক অদ্ভুত ভদ্রলোক এসেছিলেন।

বঙ্কিম ॥ ভদ্রলোক না ভূত? কোনটা ঠিক করে বলো।

পূর্ণচন্দ্র ॥ পোশাকে তিনি মুসলমান, কিন্তু আসলে তিনি হিন্দু। নকল দাড়ি লাগিয়ে একজন হিন্দু ভদ্রলোক এসেছিলেন মুসলমানের ছদ্মবেশে।

বঙ্কিম ॥ কেন এসেছিলেন ?

পূর্ণচন্দ্র ॥ তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

বঙ্কিম ॥ আমার সঙ্গে দেখা করতে ছদ্মবেশে কেন ?

পূর্ণচন্দ্র ॥ তোমার কাছে তিনি এসেছেন সেটা বাইরে জানাজানি হলে তাঁর প্রাণ যাবে—এই ছিল তাঁর আশঙ্কা।

বঙ্কিম ॥ বটে ! কে লোকটি ! পরিচয় দিলেন না ?

পূর্ণচন্দ্র ॥ না, সেজদা, শুধু এইটুকুই বলেছিলেন, তিনি নীলকর সাহেবদের কর্মচারী। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার থেকে গরীব চাষীদের বাঁচাবার জন্য তুমি যে চেষ্টা করছো, সেজন্য তিনি খুব খুশী।

বঙ্কিম ॥ শুধু এই কথাটা জানাতে অত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তিনি এলেন ?

পূর্ণচন্দ্র ॥ না সেজদা। নীলকর সাহেবরা একটা ষড়যন্ত্র করেছে, তোমাকে খুন করবে। উনি কাল হঠাৎ জানতে পেরেছেন সেই খুন করবার তারিখ হলো আজ। উনি ছুটে এসেছিলেন তোমাকে সতর্ক করতে। তোমাকে না পেয়ে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন আমাদেব। আজ রাতে এ বাড়ি আক্রমণ করবে।

বঙ্কিম ॥ বটে ! লোকটি আমার 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্লটটা জানলো কি করে ? তাতে এমনি সব ষড়যন্ত্রের কথাই আছে।

পূর্ণচন্দ্র ॥ না সেজদা, তুমি জিনিসটাকে অমন হেসে উড়িয়ে দিও না। ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই খুব গুরুতর।

বঙ্কিম ॥ আমাকে খুন করা হবে আজ ?

[রাজলক্ষ্মীর চা এবং রামুর তামাক লইয়া প্রবেশ]

রাজলক্ষ্মী ।। ওগো, কি হবে ? তোমার বন্দুকটা বের করে রাখো।

বঙ্কিম ॥ (হাসিয়া) ভাবছো কেন ? আমাকে যদি নীলকরেরা খুনই করে তবে সবচেয়ে খুশী হব আমি।

রাজলক্ষ্মী ও পূর্ণচন্দ্র ॥ কেন ?

বঙ্কিম ॥ নীলকরেরা আমাকে খুন করলে খুব সহজেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

রাজলক্ষ্মী ও পূর্ণচন্দ্র ॥ কেন ?

বঙ্কিম ॥ নীলকরেরা আমাকে খুন করলে ইংরেজ রাজত্ব কেঁপে উঠবে।,

ইংরেজ-রাজ জানবে, নীলকরেরা কি চীজ। নীলকরদের তল্পিতল্পা নিয়ে বিলেতে পালাতে হবে। নীল চাষ উঠে যাবে। বাংলার চাষীর হাড় জুড়োবে।

রাজলক্ষ্মী ॥ তুমি বলছো কি ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

পূর্ণচন্দ্র ॥ নীল চাষ তুলে দেবার জন্য তোমাকে মরতে হবে কেন ? দীনবন্ধুবাবু কলমের জোরে নীলকরদের নাভিশ্বাস তুলেছেন, এবার তুমি একটু শক্ত হাতে কলম ধর—তবেই উৎপাত চিৎপাত হবে।

বঙ্কিম ॥ বাঃ, এটা তো বেশ বলেছো পূর্ণ। (রাজলক্ষ্মীকে) না না, তুমি মিছে ভয় পেও না বৌ। অত সহজে আমি মরছি না। কালকেই আমি পুলিসকে হুকুম দিয়েছি নীলকরদের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখতে। আমার বাড়ির আশেপাশে পুলিস পাহারা আছে। বাড়িতে ঢোকবার সময়ও আমি দেখেছি। এতেও যদি তোমাদের মন না মানে, তবে আমার পিস্তলটা সিন্দুক থেকে বের করে রাখো। আর তুমি একটু ভালো করে কোরমা রাঁধাও দেখি। একটু মোগলাই খানা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। সভাসদ্‌গণ, এইবার তোমরা প্রস্থান করো। আমি রাজকার্যে মনোনিবেশ করছি। (পূর্ণ ও রাজলক্ষ্মী যাইতেছিলেন) পূর্ণ! একটু দাঁড়াও। মনে হচ্ছে তুমি দারোয়ানকে বোধহয় বলে রেখেছো আমার কাছে আজ রাতে কেউ না আসে!

পূর্ণচন্দ্র ॥ হ্যাঁ সেজদা, তা বলেছি।

বঙ্কিম ॥ তুমি দারোয়ানকে গিয়ে বলে এসো, কাউকে যেন আসতে না দেয়—একজন বাদে।

পূর্ণচন্দ্র ॥ কে সে সেজদা ?

বঙ্কিম ॥ আমার পেশকার। তোমাদের তো বলেছি, মরেলগঞ্জে সেদিন আসামী নীলকর সাহেবদের আর তাদের লাঠিয়ালদের গ্রেপ্তার করতে যাই, সেদিন উভয় পক্ষে যে খণ্ডযুদ্ধ হয় তাতে ওরা আমার কিছু করতে পারে না কিন্তু আমার পেশকারকে গায়েব করে। সেই থেকে এই পেশকারকে উদ্ধার করবার জন্য আমি প্রাণপণ করছি। খবর পেয়েছি, পেশকার নাকি তাদের হাত থেকে কোনমতে পালিয়েছে। কিন্তু নীলকর সাহেবদের লোকেরা নাকি তার পিছু নিয়েছে। পেশকার হয়তো আশ্রয়ের জন্য আমার কাছে আসতে পারে। তুমি দারোয়ানকে নিজে

বলে এসো, সে যদি আসে তাকে যেন আমার কাছে আসতে দেয়, সে যখনই হোক—যত রাতেই হোক।

[পূর্ণচন্দ্র দারোয়ানের উদ্দেশে গেলেন। রাজলক্ষ্মীও অন্দরে যাইতেছিলেন কিন্তু বঙ্কিম বাধা দিলেন—]

বঙ্কিম ॥ (রাজলক্ষ্মীকে) তুমি আবার কোথায় যাচ্ছো?

রাজলক্ষ্মী ॥ বাঁদীকে কোর্মা রাঁধতে হুকুম করেননি কি জাঁহাপনা?

বঙ্কিম ॥ ও, হ্যাঁ। সে হুকুম রদ করছি। হুকুম করছি—বসো। আমার দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি তোমাকে পড়ে শোনানো দেখছি আমার এক নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা দাঁড়াও। (রাজলক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইলেন) না না, দাঁড়াও মানে তোমাকে দাঁড়াতে হবে না। বসে শোনো। না না, আগে বলো, যা শুনিয়েছি, তার কতটা তোমার মনে আছে!

রাজলক্ষ্মী ॥ তবেই হয়েছে। আচ্ছা বেশ, আমি সেটা লিখেছি।

বঙ্কিম ॥ লিখেছো?

রাজলক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ, লিখেছি।

[র‍্যাকে বই এবং খাতাপত্র ছিল। তাহার মধ্য হইতে একটি চিঠি বাহির করিয়া রাজলক্ষ্মী বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে দিলেন।]

রাজলক্ষ্মী ॥ তুমি এটা পড। আমি বরং ততক্ষণ তোমার কোর্মার ব্যবস্থা করছি।

বঙ্কিম ॥ (চিঠিটা দেখিতে দেখিতে) ভুল হলো। আমার কোর্মা নয়, পাঁঠার কোর্মা।

রাজলক্ষ্মী ॥ ভুলটা মানছি।

[হাসিতে হাসিতে অন্দরে প্রস্থান]

বঙ্কিম ॥ (চিঠিটা পডিতে লাগিলেন।)

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং

খুলনা

শ্রীচরণকমলেষু

বাবা, আমার শতকোটি প্রণাম জানিবে। তোমার জামাই এখানে নীলকর সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করিতেছেন। সেই জন্য বড় ভয়ে ভয়ে

থাকি। মা দুর্গার কৃপায় তোমার জামাই জিতিতেছেন। আবার একটা নবেল লিখিতেছেন।...”

[পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ]

বঙ্কিম ॥ এই যে পূর্ণ! কোথায় গিয়েছিলে?

পূর্ণচন্দ্র ॥ কেন, তুমিই তো পাঠালে।

বঙ্কিম ॥ ও, হ্যাঁ। দারোয়ানকে বলে এসেছো?

পূর্ণচন্দ্র ॥ হ্যাঁ বলে এলাম। পেশকারবাবু এলে তাঁকে যেন না আটকায়।

বঙ্কিম ॥ কিন্তু আমি আটকে যাচ্ছি।

পূর্ণচন্দ্র ॥ আটকে যাচ্ছো!

বঙ্কিম ॥ হ্যাঁ তোমার বৌদির সব ভালো, কেবল লেখাটা অস্পষ্ট। (চিঠিখানি পূর্ণচন্দ্রকে আগাইয়া দিয়া) আচ্ছা, দেখ তো তুমি পড়তে পারো নাকি! —এই এখান থেকে।

পূর্ণচন্দ্র ॥ (চিঠিটি লইয়া পড়িতে লাগিলেন) “আবার একটা নবেল লিখিতেছেন। গল্পটা শুনিলে গায়ে কাঁটা দেয়। বাংলা দেশে পাঠানরা স্বাধীন ছিলো। দিল্লীর মোগলরা তাহা সহিলেন না। মোগল পাঠানে লড়াই হইল। পাঠানরাজ দায়ুদ খাঁ পরাজিত হইয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। বাংলা দেশ মোগলের অধীন হইল। কিন্তু শান্তি হইল না। পাঠানদের অধীপতি কতলু খাঁ। তিনি খুব উৎপাত শুরু করায় তাঁহাকে দমন করিতে দিল্লীশ্বর আকবর তাঁহার রাজপুতসেনাপতি মানসিংহকে বাংলা দেশে পাঠাইলেন। মানসিংহের সহিত তাঁহার প্রিয়তম পুত্র জগৎ সিংহও যুদ্ধে আসিয়াছেন। এদিকে গড়মান্দারণের রাজা বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা পরমাসুন্দরী তিলোত্তমা তাঁহার ধাত্রীমা বিমলাকে লইয়া শৈলেশ্বরের মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় খুব ঝড়বৃষ্টি শুরু হইল। তাঁহাদের রক্ষীরা প্রাণ বাঁচাইতে পলাইল। ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে জগৎসিংহ পাঠানদের খোঁজ লইতে বাহির হইয়াছিলেন। ঝড়বৃষ্টিতে তিনিও শৈলেশ্বরের মন্দিরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে খুব প্রীতি জন্মিল বটে, কিন্তু কেহই পরিচয় দিলেন না। তবে স্থির হইল, ঐ দিন হইতে পক্ষান্তরে রাত্রিকালে ঐ মন্দিরেই বিমলা জগৎসিংহের সাক্ষাৎ পাইবে।...”

বঙ্কিম ॥ আশ্চর্য! যা লিখতে আমার বারোটি পাতা লেগেছে, তোমার বৌঠান তা বারো লাইনে লিখে ফেলেছেন। আমাকে এভাবে বধ করলে-ও দুঃখ হচ্ছে না পূর্ণ।...তারপর?

পূর্ণচন্দ্র ॥ (পুনরায় পত্রপাঠ) "পনেরো দিন পরে শৈলেশ্বরের মন্দিরে জগৎ সিংহের সহিত বিমলার সাক্ষাৎ হইল। জগৎসিংহ তিলোত্তমার পরিচয় পাইলেন। তিলোত্তমাকে আর একবার দেখিবার জন্য জগৎসিংহ ব্যাকুল হইলে জগৎসিংহকে লইয়া বিমলা গড়মান্দারণে যাইবার জন্য খুব সাবধানে অগ্রসর হইল। গুপ্তপথে জগৎসিংহকে লইয়া বিমলা দুর্গে প্রবেশ করিল। জগৎসিংহ যখন তিলোত্তমার কক্ষে, তখন ঐ গুপ্তপথেই জগৎসিংহের অনুসরণকারী পাঠান সেনাপতি ওসমানও গোপনে ঐ দুর্গে প্রবেশ করিল।..."

বঙ্কিম ॥ (মৃদু হাসিয়া) তারপর?

পূর্ণচন্দ্র ॥ (পুনরায় পত্রপাঠ) "ওসমানের প্রথম শিকার হইল বিমলা। বিমলার হাত হইতে দুর্গের গুপ্তপথের চাবিটি কাড়িয়া লইয়া ওসমান বিমলাকে বিমলারই ওড়না দিয়া বাঁধিয়া রাখিল।"

বঙ্কিম ॥ তারপর?

পূর্ণচন্দ্র ॥ (পুনরায় পত্রপাঠ) "বাবা, আমি এই পর্যন্ত পড়িয়াছি, ইহাতেই আমার গায়ে কাঁটা দেয়, রাত্রে ঘুম হয় না।"

[বঙ্কিম উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। অন্দর হইতে রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ]

রাজলক্ষ্মী ॥ ব্যাপার কি?

বঙ্কিম ॥ (পূর্ণের হাত হইতে চিঠিটি রাজলক্ষ্মীকে দিলেন) তুমি যে এত ভালো বাংলা লিখতে শিখছো—

রাজলক্ষ্মী ॥ যেটুকু শিখেছি, তুমি শিখিয়েছো।

বঙ্কিম ॥ (দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপিটি রাজলক্ষ্মীর হাতে দিলেন) ঐ অধ্যায়ের বাকিটুকু পড় দেখি। তোমার মুখে শুনি। এই যে, এখান থেকে—

রাজলক্ষ্মী ॥ (পাণ্ডুলিপি পাঠ) "এইরূপে বহুসংখ্যক পাঠান-সেনা নিঃশব্দে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। শেষে যে ব্যক্তি গবাক্ষ-নিকটে আসিল ওসমান তাহাকে কহিলেন, "আর না, তোমরা বাহিরে থাক; আমার পূর্বকথিত

সংকেতধ্বনি শুনিলে তোমরা বাহির হইতে দুর্গ আক্রমণ করিও; এই কথা তুমি তাজ খাঁকে বলিও।"

[বাহির হইতে ভৃত্য রামুর প্রবেশ]

রামু॥ হুজুর! পেশকার সাহেব!

[কক্ষমধ্যে যেন বজ্রপতন হইল!]

বঙ্কিম॥ (শশব্যস্তে) কই, কোথায়? নিয়ে আয় তাকে। (রামু চলিয়া গেল) তোমরা সব ভেতরে যাও।

[বঙ্কিম পাণ্ডুলিপিটি তুলিয়া রাখিলেন। রাজলক্ষ্মী তাঁহার চিঠিটি লইয়া অন্দরে গেলেন। পূর্ণচন্দ্র তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রামু পেশকারকে লইয়া প্রবেশ করিল।]

বঙ্কিম॥ (রামুকে) তামাক।

[রামু অন্দরে চলিয়া গেল। পেশকারের চেহারা দেখিলে বোঝা যায় যে, তাহার উপর দিয়া নিদারুণ ঝড় বহিয়া গিয়াছে।]

বঙ্কিম॥ পেশকারবাবু, আপনাকে যে জীবিত অবস্থায় ফিরে পাবো, এ আশা আমার ছিল না।

পেশকার॥ কপালে হয়ত আরো অনেক কষ্ট আছে, তাই বেঁচে রয়েছি হুজুর!

বঙ্কিম॥ আমার কাছে যখন একবার পৌঁছে গেছেন তখন আর আপনার কোন ভাবনা নেই। আপনার বাড়িতেও আমি কিছু পুলিস পাহারা রাখবো।

পেশকার॥ কিন্তু আমি যে ছাড়া পাইনি হুজুর।

বঙ্কিম॥ মানে?

পেশকার॥ ওরা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রাণের ভয় দেখায়! প্রথমে বলে, নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে যে মামলা চলছে তার সব নথিপত্র যদি এনে দিতে পার, তবে শুধু ছেড়েই দেব না, দশ হাজার টাকাও দেব।

বঙ্কিম॥ বটে!

পেশকার॥ হ্যাঁ হুজুর। কিন্তু সে প্রলোভনে আমি কান দিইনি হুজুর। অকথ্য নির্যাতন চালালো আমার ওপর। কয়েকদিন খেতে দিলো না।

মারধোর করলো। তবু—তবু আমি রাজী হইনি হুজুর। আপনার মুখখানি মনে পড়তো সব সময়। আর তাতেই পেতাম আমি মনের জোর।

বঙ্কিম ॥ আশ্চর্য! আপনি যাতে পুরস্কৃত হন, আমি তার ব্যবস্থা করবো পেশকারবাবু!

পেশকার ॥ কিন্তু আমি এখনও মুক্তি পাইনি হুজুর।

বঙ্কিম ॥ আপনি যখন আমার কাছে একবার এসে গেছেন, কার সাধ্য আপনাকে আর ধরে। আপনি জানেন কিনা জানি না, এই বছরই জুন মাসে মরেল আর লাইটফুট বিলেতে পালিয়েছে বটে, কিন্তু হিলি বোম্বাই শহরে ধরা পড়ে এখন হাজতে পচে মরছে। দায়রার বিচারে দৌলত চৌকিদারের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। চৌত্রিশজন আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের হুকুম হয়েছে। ওরা সব ঢিট হয়ে গেছে।

পেশকার ॥ না না, হুজুর। তলে তলে ওরা ছুরি শানাচ্ছে। সাংঘাতিক লোক ওরা। মরেও ওরা মরবে না। আমাকে ওরা মারবে।

বঙ্কিম ॥ আঃ! আমি বলছি, কোনো ভয় নেই আপনার।

পশকার ॥ আমি বলছি ভয় আছে। একজন নীলকর সাহেব আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। বাইরে সে দাঁড়িয়ে আছে।

বঙ্কিম। এত দুঃসাহস!

পেশকার ॥ এত দুঃসাহস। আমাকে বলেছে, আজ রাতে আপনার সঙ্গে যদি তার দেখা করিয়ে দিতে পারি তবেই আমার মুক্তি। নতুবা আমি গেছি।

[ক্ষণকাল নিস্তব্ধতা]

বঙ্কিম ॥ আমার সঙ্গে সাহেবটা দেখা করতে চায়?

পেশকার ॥ হ্যাঁ। হুজুর, দেখা করতে চায়। আপনি দেখা করতে রাজী হবেন না বলেই আমাকে ধরে এনেছে। আমাকে বাঁচাতে আমার অনুরোধে যদি আপনি তার সঙ্গে দেখা করেন—এই তার আশা।

বঙ্কিম ॥ বটে! কি জন্য সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? কিছু জানেন আপনি?

পেশকার ॥ আপনার কাছে কি যেন confession করবে।

বঙ্কিক ॥ ও। লোকটা একা, না আর কেউ সঙ্গে আছে?

পেশকার ॥ তা বলতে পারব না—তবে ওকে ছাড়া আর কাউকে আমি দেখিনি।

বঙ্কিম ॥ হুঁ। সায়েবটার সঙ্গে অস্ত্রটস্ত্র কিছু আছে মনে হয়?

পেশকার ॥ একটা রিভলবার থাকা অসম্ভব নয়। তবে আমি দেখিনি।

বঙ্কিম ॥ হুঁ, confession করবে বলছে?

পেশকার ॥ হ্যাঁ হুজুর।

বঙ্কিম ॥ (ঘড়ি দেখিয়া) বেশ রাতও হয়েছে। আচ্ছা যান, আপনি তাকে নিয়ে আসুন। দাঁড়ান।

[রামু আসিয়া তামাকের কল্কি বদলাইয়া দিল।]

বঙ্কিম ॥ রামু, তুমি পেশকারবাবুর সঙ্গে যাও। দারোয়ানকে বলো ইনি যে সাহেবকে নিয়ে আসবেন, তাকে যেন আসতে দেয়।

[রামু ও পেশকারের প্রস্থান। রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ।]

রাজলক্ষ্মী ॥ শোনো, আমার মন বলছে এখনই একটা অঘটন ঘটবে।

বঙ্কিম ॥ সেকি! কেন বল তো?

রাজলক্ষ্মী ॥ এত রাত্রে ঐ নীলকর সাহেবটাকে আসতে বললে?

বঙ্কিম ॥ আড়ি পেতে সব শুনছিলে বুঝি?

রাজলক্ষ্মী ॥ তোমার যা গলা, আড়ি পেতে শুনতে হয় না। আমি বলছি, আজ তুমি ওর সঙ্গে দেখা করো না। ওকে বলে দাও, কাল কোর্টে গিয়ে যেন তোমার সঙ্গে দেখা করে।

বঙ্কিম ॥ কি ভীতু তুমি। আমার তিলোত্তমা কিন্তু এত ভীতু নয়।

[একটি রিভলবার লইয়া পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ]

পূর্ণচন্দ্র ॥ সেজদা, তোমার রিভলবারটা ঠিকই আছে।

বঙ্কিম ॥ গুলি ভরে দিয়েছো?

পূর্ণচন্দ্র ॥ দিয়েছি।

[বঙ্কিমচন্দ্র রিভলবারটি পূর্ণচন্দ্রের হাত হইতে লইয়া চটপট লুকাইয়া রাখিলেন।]

বঙ্কিম ॥ (রাজলক্ষ্মীকে) হলো তো? এবার আমার কোর্মার কতদূর গিয়ে দেখ।

রাজলক্ষ্মী ॥ কোর্মাটা তোমার নয়, পাঁঠার।

বঙ্কিম ॥ ও কিছু নয়। মুনীনাং চ মতিভ্রম্। এসো।

রাজলক্ষ্মী ॥ যাচ্ছি।...ঠাকুরপো! তুমি এখানে থেকো।

বঙ্কিম ॥ না। তা হবে না। এটা গোপনীয় রাজকার্য—আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। পূর্ণ, তুমি বরং—

পূর্ণচন্দ্র ॥ বলো।

বঙ্কিম। কোর্মাটা কেমন হচ্ছে, চাখবার জন্য রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে থাকো। না না, পূর্ণ শোন। (পূর্ণ কাছে আসিলে বঙ্কিম কানে কানে তাহাকে কি বলিলেন।) ওরা আসছে—তোমরা—(যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন)।

[রাজলক্ষ্মী এবং পূর্ণচন্দ্র অন্দরে চলিয়া গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পেশকারসহ নীলকর সাহেবের প্রবেশ]

নীলকর ॥ Good evening!

বঙ্কিম ॥ Good evening. Take your seat. What can I do for you Mr.—

নীলকর ॥ Mr. Robinson. হামি এডেশে ঠেকে বাংলাটা শিখেছে। হামি হুজুর একটা confession করিবে।

বঙ্কিম ॥ কি confession মিঃ রবিনসন?

রবিনসন ॥ নীল চাষীদের কাছে হামাডের হার হইল। হুজুর না ঠাকিলে হামাডের জিট্ হইত। হাঁ—এটা হামি confession করিটেছি।

বঙ্কিম ॥ Stop all this nonsense.

রবিনসন ॥ টবে হামার আর একটা confession হুজুরকে শুনিটে হইবে।

বঙ্কিম ॥ Yes—

রবিনসন ॥ হুজুর এ জিলা হইটে transfer লইলে হামাডের সুবিডা হইবেক।

বঙ্কিম ॥ Yes, go on. Let me see how far you can go.

রবিনসন ॥ Thanks very much. হুজুর যশোর জিলা ছাড়িয়া গেলে হুজুরের যে ক্ষটি হইবে হামরা নীলকররা পূরণ করিয়া ডিবে।

বঙ্কিম ॥ Go on...

রবিনসন ॥ এ ক্ষটির পরিমাণ যডি লাখো টাকা হয়, ওভি হামরা ডিবে—

বঙ্কিম ॥ Yes...go on...

রবিনসন ॥ Secretly ডিবে। No, not even a crow will know.

বঙ্কিম ॥ কাক-পক্ষীও জানবে না, কেমন? কিন্তু হামার পেশকার জানিলো।

রবিনসন ॥ পেশকারবাবু—উনি হামার হাটের লোক আছে। পেশকার-বাবুভি ড্যামেজ পাইবেন।

বঙ্কিম ॥ I see. What next? Go on please.

রবিনসন ॥ হামার third confessionটা এইবার শুনিবেন।

বঙ্কিম ॥ Yes—

রবিনসন ॥ আপনি এ জিলা হইটে নিজে না সরিলে হামরা আপনাকে সরাবে।

বঙ্কিম ॥ সরাবে মানে?

রবিনসন ॥ I mean—

বঙ্কিম ॥ হামাকে খতম করিবে?

রবিনসন ॥ Well, it comes to that.

বঙ্কিম ॥ কিন্তু হামি বাঁচিটে চাই।

রবিনসন ॥ That's good. My terms are there. লাখ টাকা লইয়া বাঁচুন।

[বঙ্কিম ঘড়ি দেখিলেন। রবিনসন সাহেব তাহার রিভলবারটি পকেট হইতে বাহির করিয়া হাতে নাচাইতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্রও ইহা দেখামাত্র তাঁহার নিজের রিভলবারটি হাতে লইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবিনসন পরস্পর পরস্পরের চোখে চোখে তাকাইয়া রহিলেন। দুই জন পুলিসসহ বাহির হইতে পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ]

পূর্ণচন্দ্র ॥ সেজদা, পুলিস নিয়ে এসেছি।

বঙ্কিম ॥ (রবিনসনের চোখ হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া পুলিসের প্রতি) সাহেবটাকে গ্রেপ্তার কর।

[রবিনসন চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বঙ্কিমচন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]

বঙ্কিম ॥ (রবিনসনকে) Hands up, I say. Otherwise I will shoot you to death. আমি তোমাকে কুকুরের মত গুলি করে মারবো।

[রবিনসন চোখ ঘুরাইয়া একবার সকলকে দেখিয়া লইল।

মুহূর্তকাল কি ভাবিল। তৎপর রিভলবারটি ফেলিয়া দিয়া দুই হাত তুলিয়া দাঁড়াইল। পুলিসদ্বয় তাহার দুই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।]

বঙ্কিম॥ (রবিনসনকে) That's good. ঘুষ দিতে এসেছিলে আমাকে, খুন করবে ভয় দেখাচ্ছিলে, এই দুই serious chargeএ আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করে হাজতে পাঠাচ্ছি। তোমার রিভলবার আমার কাছে জমা রইল। Get out.

[পুলিসদ্বয় রবিনসনকে লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।]

পেশকার॥ (ছুটিয়া আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পায়ে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে) আপনি হুজুর দেবতা—আপনি হুজুর দেবতা!

[বঙ্কিমচন্দ্র পেশকারকে ধরিয়া তুলিলেন।]

বঙ্কিম॥ দেবতা হতে চাই না পেশকারবাবু। দেবতা হওয়ার চেয়ে মানুষ হওয়া বড। আপনি যা মনুষ্যত্ব দেখিয়েছেন, সে বড় কম নয়।…আজ আমরা দুজনে একসঙ্গে বসে খাবো। পূর্ণ! গিয়ে দেখ, তোমার কোর্মাটা কতদূর!

পূর্ণচন্দ্র॥ তুমি পাঁঠার কোর্মার কথা বলছো বোধহয়।

বঙ্কিম॥ ও হ্যাঁ, পাঁঠার কোর্মা, তোমার নয়।

[বাহিরে একটি গুলির শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্দর হইতে রাজলক্ষ্মীর আর্তনাদ শোনা গেল।]

বঙ্কিম॥ ব্যাপার কি? দেখ তো পূর্ণ!

[পূর্ণ অন্দরে ছুটিয়া গেলেন। বাহির হইতে দারোয়ানের চীৎকার শোনা গেল: "হুজুর, সাহেব ভাগ গিয়া—সাহেব ভাগ গিয়া।" ছুটিয়া আসিল পূর্বোক্ত একটি পুলিস।]

পুলিস॥ হুজুর, সর্বনাশ!

বঙ্কিম॥ সাহেবটা ভেগেছে?

পুলিস॥ হ্যাঁ হুজুর।

বঙ্কিম॥ সাহেব তো ছিলো একা, তোমরা ছিলে দু'জন।

পুলিস॥ গেট যেই পার হয়েছি সাহেবটা শিস দিতেই অন্ধকার থেকে বন্দুক হাতে বেরিয়ে এলো আর একটা সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে করলো গুলি। আমরা বেসামাল হতেই সাহেবদুটো অন্ধকারে পালিয়ে গেল।

বঙ্কিম ॥ গুলি তোমাদের গায়ে লেগেছে?

পুলিস ॥ না হুজুর।

বঙ্কিম ॥ তোমার সঙ্গের আর একজন? সে কোথায়?

পুলিস ॥ সে সাহেবদের পিছু নিয়েছে হুজুর।

পেশকার ॥ আমার ভয় হচ্ছে, সাহেবরা আজ রাত্রে এই বাড়ি আক্রমণ করবে।

[পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ]

পূর্ণচন্দ্র ॥ বৌঠান মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন।

বঙ্কিম ॥ তিলোত্তমাও মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। ভয় নেই চোখে মুখে জলের ছিটে দাও। চোখ মেলবে। এই রকমই হয়, এই রকমই হয়। (পেশকারকে) শুনুন।

[পূর্ণচন্দ্র অন্দরে ছুটিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপিটা টানিয়া লইলেন। পাতা উলটাইয়া উহার একটি অংশ বাহির করিলেন এবং পড়িতে লাগিলেন। পেশকারবাবু অবাক হইয়া শুনিতে লাগিলেন।]

বঙ্কিম ॥ (পাণ্ডুলিপি পাঠ) "তিলোত্তমা চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। বিমলা কহিলেন, "তিলোত্তমার জ্ঞান হইতেছে; রাজকুমার! রাজকুমার! এখনও তিলোত্তমাকে বাঁচাও।"

রাজকুমার কহিলেন, "এ ঘরের মধ্যে থাকিলে কার সাধ্য রক্ষা করে! এখনও যদি 'ঘর হইতে বাহির হইতে পারিতে, তবে আমি তোমাদিগকে দুর্গের বাহিরে লইয়া যাইতে পারিলেও পারিতাম; কিন্তু তিলোত্তমার ত গতিশক্তি নাই। বিমলা! ঐ পাঠান সিঁড়িতে উঠিতেছে। আমি অগ্রে প্রাণ দিবই, কিন্তু পরিতাপ যে, প্রাণ দিয়াও তোমাদের বাঁচাইতে পারিলাম না।"

[পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ]

পূর্ণচন্দ্র ॥ বৌঠানের জ্ঞান ফিরেছে।

বঙ্কিম ॥ হ্যাঁ, তাতে ব্যাপারটা আরো জটিল হলো। তিলোত্তমাকে বাঁচাতে সিংহবিক্রমে একাই লড়তে লাগলেন। বীরেন্দ্রসিংহ। বহু পাঠান সৈন্য বধ করে শেষে নিজে হলেন আহত। বীরেন্দ্রসিংহও হলেন বন্দী।

এবার বন্দী হলেন জগৎসিংহ, তিলোত্তমা এবং বিমলা। গড়মান্দারণ দুর্গ জয় করলেন পাঠান সেনাপতি ওসমান।

পূর্ণচন্দ্র ॥ সেজদা!

বঙ্কিম ॥ এইখানেই শেষ হলো দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম খণ্ড। বুঝেছেন পেশকারবাবু?

পূর্ণচন্দ্র ॥ সেজদা!

বঙ্কিম ॥ কি?

পূর্ণচন্দ্র ॥ বৌঠানের জ্ঞান ফিরেছে।

বঙ্কিম ॥ ফিরেছে? তবে আর ভাবনা কি! এবার আমাদের খেতে দিতে বলো। ভারি খিদে পেয়েছে।

—যবনিকা—

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

[বারুইপুরে ম্যাজিস্ট্রেট-কুঠি। বৈঠকখানা। ১৮৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক সন্ধ্যা। বঙ্কিমচন্দ্র একখানি চিঠি লিখিতে-ছিলেন। বন্ধু দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের 'সংবাদ প্রভাকর'এ প্রকাশিত দুর্গেশনন্দিনীর প্রশস্তি পাঠ করিতেছিলেন।]

বঙ্কিম ॥ আঃ! আজ কতই তারিখ?

[পাঠে তন্ময় দীনবন্ধুর কর্ণে এই জিজ্ঞাসা পৌঁছাইল না।]

বঙ্কিম ॥ আঃ! বলো না দীনুদা, আজ কত তারিখ।

দীনবন্ধু ॥ তুমি একজন সিভিলিয়ান হাকিম। তারিখ মনে রাখতে পারো না? আজ ১৫ই সেপ্টেম্বর। কোন সাল, আশা করি বলে দিতে হবে না?

বঙ্কিম ॥ না, সেটা আমার মনে আছে। আঠারো শ' পঁয়ষট্টি সাল। আজ কিছুদিন থেকে দেখছি, তারিখ মনে রাখতে পারি না। লোকের নামও মনে থাকে না।

দীনবন্ধু ॥ ওটাও একটা প্রতিভার লক্ষণ। ওতে বোঝা যায়, পৃথিবী ছেড়ে তুমি কতটা উঁচুতে উঠেছো।

বঙ্কিম ॥ না। এটা মানি না। তাহলে দীনবন্ধু মিত্রের সন তারিখ সব ভুলে যাওয়া উচিত ছিলো।

দীনবন্ধু ॥ তা যদি বলো, সন-তারিখের চেয়েও অনেক বড় জিনিস আমি ভুলে যাই। খেতে মনে থাকে না এক এক দিন।

বঙ্কিম ॥ নাঃ, তাহলে আর বড হওয়া গেল না দীনুভাই। খেতে আমার খুবই মনে থাকে। আজ তবে ১৮৬৫ সালের—কতই সেপ্টেম্বর বললে?

দীনবন্ধু ॥ ১৫ই সেপ্টেম্বর। এটা যে আঠারো শ' পঁয়ষট্টি সাল এটা তো তোমার খুন মনে পড়ছে বাঁকাচাঁদ!

বঙ্কিম ॥ তা পডছে।

দীনবন্ধু ॥ কেন বল তো?

বঙ্কিম ।। যে জন্য ১৮৬০ সালটি তোমার কিছুতেই ভোলবার কথা নয় ।

দীনবন্ধু ।। (হাসিয়া) ১৮৬০ সালে আমার 'নীলদর্পণ' ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো । তোমার 'দুর্গেশনন্দিনী' ভূমিষ্ঠ হলো এই ১৮৬৫ সালে । এই তো ?

[উভয়েই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন ।]

দীনবন্ধু ।। বঙ্কিম ! তুমি যখন খুলনায় বসে 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখছিলে, তখনই আমি ভবিষ্যদ্বাণী করে এসেছিলাম, তোমার এই উপন্যাসের জয়জয়কার হবে । হয়েছেও তাই । দেখছি 'সংবাদ প্রভাকর' তা স্বীকার করেছে । 'সংবাদ প্রভাকর'এর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও বলি, "আপনি এক্ষণে আমাদিগকে নবপল্লবিত অক্ষয় বৃক্ষের অমৃতফলের রসাস্বাদন করাইলেন ।"

বঙ্কিম ।। হ্যাঁ, এরা বই পড়ে এসব লিখছে, কিন্তু তুমি বন্ধু বই না পড়ে কি করে অত বড় আশীর্বাদ করেছিলে, বলো দেখি ?

দীনবন্ধু ।। শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায় ।

বঙ্কিম ।। কিন্তু আমার তো গোঁফ নেই গো ।

দীনবন্ধু ।। ছ'মাস কেটো না, তবেই দেখতে পাবে, যে গোঁফ গজিয়েছে তা গোটা বাঙালী জাতটার গলায় দড়ি দেবার পক্ষে যথেষ্ট ।

[উভয়ের উচ্চহাস্য]

বঙ্কিম ।। নাঃ, লাটসাহেবের সেক্রেটারীকে চিঠিটা আর তুমি লিখতে দিলে না । থাক, কাল লিখবো । এইবার তবে বলো কি তোমার প্রাইভেট কথা ।

দীনবন্ধু ।। হ্যাঁ, এইবার সেটা শোনো । (ট্যাকঘড়ি দেখিয়া) আমারও তো আবার যাওয়ার সময় হয়ে এলো ।

বঙ্কিম ।। ভেবো না । তোমার গাড়ি তৈরী আছে । বারুইপুরে এই একটা সুবিধা আছে, যানবাহন যখন তখন পাওয়া যায় ।

[দীনবন্ধু উঠিয়া অন্দরের দরজাটি অর্গলাবদ্ধ করিলেন ।]

বঙ্কিম ॥ (দীনবন্ধুর দিকে বিস্ময়ে তাকাইয়া) মানে ?

দীনবন্ধু ॥ বলেছি তো, খুবই প্রাইভেট ।

বঙ্কিম ॥ বুঝলাম । লক্ষ্মীর অশ্রাব্য ।

দীনবন্ধু ॥ হ্যাঁ । কিন্তু লক্ষ্মী-ছাড়ার শ্রাব্য ।

[উভয়ের উচ্চহাস্য। দীনবন্ধু পকেট হইতে একখানি দীর্ঘ চিঠি বাহির করিলেন।]

দীনবন্ধু ॥ একটি চিঠি। লিখছেন তোমার লক্ষ্মী।

বঙ্কিম ॥ কার কাছে ?

দীনবন্ধু ॥ তার মায়ের কাছে। আমি গিয়েছিলাম শ্বশুরবাড়ি। তোমার শ্বশুর দিয়ে গেলেন আমাকে। আমার মন্তব্য জানতে।

বঙ্কিম ॥ বটে !

দীনবন্ধু ॥ হ্যাঁ। আমি পড়ছি শোনো। (পত্রপাঠ) "মাগো, বাবার শ্রীচরণাশীর্বাদী চিঠি পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমার জামাইয়ের 'দুর্গেশ-নন্দিনী' বই এতদিনে শেষ হইয়াছে। বাবা বাকিটা জানিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু গল্পের শেষের অংশ বাবাকে লিখিতে বড লজ্জা হয়, তাই তোমাকে লিখিতেছি। তুমি পড়িয়া বাবাকে মুখে বলি ও।"

[বঙ্কিম উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।]

বঙ্কিম ॥ বুঝেছি। এবার অনেক প্রেম-ট্রেমের ব্যাপার রয়েছে কিনা !

দীনবন্ধু ॥ (পত্রপাঠ) "পাঠান সেনাপতি ওসমান মোগল সেনাপতি জগৎ-সিংহকে এবং সেই সঙ্গে বীরেন্দ্রসিংহ, তাঁহার কুমারী কন্যা তিলোত্তমা এবং তাহার ধাত্রীমাতা বিমলাকে বন্দী করিয়া পাঠান রাজ কতলু খাঁর দুর্গে আনিলেন। জগৎসিংহ আহত অবস্থায় অচৈতন্য ছিলেন। কতলু খাঁর দুর্গে তাঁহাকে সসম্মানে রাখিয়া তাঁহার যথোচিত সেবাশুশ্রূষা এবং চিকিৎসা হইতেছিল। জগৎসিংহের জীবন রক্ষা হইলে তাঁহার প্রাণবিনিময়ে পাঠানরা মোগলদের সঙ্গে সুবিধাজনক সর্তে সন্ধি করিতে পারিবে, হইাই ছিলো পাঠানরাজের অভিসন্ধি।"

বঙ্কিম ॥ অভিসন্ধি ! না, বাংলাটা তোমাদের লক্ষ্মী বেশ ভালোই শিখেছে।

দীনবন্ধু ॥ তার মানে তোমার ছোঁয়াচ লেগেছে—স্বামীর ব্যাধিতে ভুগছে। (পত্রপাঠ) "জগৎসিংহের যখন জ্ঞান হইল তখন তিনি দেখিলেন, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া এক পরমাসুন্দরী যুবতী তাঁহার ক্ষতে ঔষধ লেপন করিতেছেন। অদূরে গালিচার উপরে একজন সম্ভ্রান্ত পাঠান বসিয়া পান খাইতেছেন। এই পরমাসুন্দরী হইলেন কতলু খাঁর কন্যা আয়েষা, আর ঐ পাঠান পুরুষটি হইলেন পাঠান সেনাপতি ওসমান। সংক্ষেপে লিখি,

ওসমান আয়েষার প্রণয়প্রার্থী হইলেও আয়েষার মন হরণ করিল কিন্তু এই আহত রাজপুত বীর জগৎসিংহ। তোমার জামাই-এর এ যে কি অবিচার তুমিই বল।"

বঙ্কিম॥ কই, আমাকে তো এসব কথা কখনো বলেনি লক্ষ্মী।

দীনবন্ধু॥ আসামীকে না বলে হাকিমকে বলছে। আরো শোনো—"তোমার জামাই নবেলে লিখিয়াছেন, আযেষার বয়স বাইশ, তিলোত্তমার বয়স ষোলো। কিন্তু একথাও লিখিয়াছেন, তিলোত্তমা পরম রূপবতী হইলেও যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা-মধ্যে তেমনি আয়েষা।"

বঙ্কিম॥ সর্বনাশ! রাজলক্ষ্মীর ধারণা ও আমার তিলোত্তমা।

দীনবন্ধু॥ সর্বনাশের এখনই কি হয়েছে? শোনো—ধৈর্য ধরে শোনো। (পত্রপাঠ) "মুখে কিছু না বলিলেও এই পদ্মফুলটি জগৎসিংহের প্রেমে মজিল। এদিকে কতলু খাঁ বন্দী বীরেন্দ্র সিংহের বীরোচিত দর্পে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করিলেন। বধ্যভূমিতে জানা গেল যে, বিমলা বীরেন্দ্র সিংহেরই অন্যতমা পত্নী ছিলেন—নিম্নশ্রেণীতে বিমলার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া বিবাহ-কাহিনী গোপন ছিল। দেখিলে মা, তোমার জামাইএর পেটে পেটে এত।"

[অন্দর দরজার অন্তরালে চুড়ির শব্দ শোনা গেল। বঙ্কিম চট্ করিয়া উঠিয়া গিয়া দরজায় কান পাতিলেন। আর কোন সাড়া পাইলেন না]

দীনবন্ধু॥ লক্ষ্মী?

বঙ্কিম। হয়তো।

দীনবন্ধু॥ থামবো?

বঙ্কিম॥ না। আমরা রাজকার্য করছি।

দীনবন্ধু॥ (পত্রপাঠ) "বিমলার গুপ্তপথের দৌলতেই ওসমান গড়মান্দারণ দুর্গ সহজে জয় করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বিমলার প্রতি ওসমানের কিছুটা কৃতজ্ঞতা ছিল। ওসমানের সাহায্যে তিলোত্তমাকে দুর্গ হইতে পলায়ন করিবার সুযোগ দিলেন বিমলা। তিলোত্তমা কিন্তু পলায়ন না করিয়া ওসমানের সংকেত-আংটির সাহায্যে কারাগারে নিক্ষিপ্ত জগৎ-সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জগৎসিংহের ধারণা ছিলো তিলোত্তমা নবাবের উপপত্নী হইয়াছে। প্রণয় সম্ভাষণের পরিবর্তে জগৎসিংহ

তিলোত্তমাকে কঠোর সম্ভাষণই করিলেন, 'তুমি ফিরিয়া যাও, পূর্বক থ বিস্মৃত হও।' তিলোত্তমা মূর্ছিত হইয়া পড়িল। সংবাদ পাইয়া, যে তাহাকে সস্নেহে শুশ্রূষার্থে স্বভবনে প্রেরণ করিল, সে হইল আয়েষা।"

বঙ্কিম ॥ আমরা একশ' নব্বইটি পাতা কেটেকুটে এই কয়েকটা লাইনে দাঁড করালে স্বামীহত্যা না হোক নরহত্যা হয় কি না, তুমি বলো বন্ধু।

দীনবন্ধু ॥ তুমি থামো বঙ্কিম। মনে রেখো আজ তুমি আসামী। অভিযোগ আগে শেষ হোক। শোনো। (পত্রপাঠ) "তিলোত্তমা আয়েষার ভবনে চলিয়া গেলে আয়েষা বলিলেন, 'জগৎসিংহ! তুমি আমার সঙ্গে বাহিরে আইস, অশ্বশালায় অশ্ব আছে, দিব; অদ্য রাত্রেই নিজ শিবিরে যাইও।' জগৎসিংহ কহিলেন, 'আয়েষা, আমি যাইব না।' উভয়েই হঠাৎ শুনিলেন তৃতীয় কণ্ঠস্বর। উভয়েই তাকাইয়া দেখেন, পাঠান সেনাপতি স্বয়ং ওসমান।"

বঙ্কিম ॥ "নিশীথে একাকিনী বন্দিসহবাস নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম। বন্দীর জন্য নিশীথে কারাগারে অনিয়ম প্রবেশও উত্তম।"

দীনবন্ধু ॥ (চিঠি হইতে পাঠ) "এ নিশীথে একাকিনী কারাগার মধ্যে আসিয়া এই বন্দীর সহিত আলাপ করা আমার ইচ্ছা। আমার কর্ম উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।"

বঙ্কিম ॥ "প্রয়োজন আছে কি না, কাল প্রাতে নবাবের মুখে শুনিবে।"

দীনবন্ধু ॥ (চিঠি হইতে পাঠ) "যখন পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তখন তাহার উত্তর দিব। তোমার চিন্তা নাই।"

বঙ্কিম ॥ "আর যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি?"

দীনবন্ধু ॥ (চিঠি হইতে পাঠ) "ওসমান! যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!"

বঙ্কিম ॥ একি! থামলে যে?

দীনবন্ধু ॥ পত্রলেখিকা থেমে গেছেন। আমি কি আর করতে পারি বঙ্কিম?

বঙ্কিম ॥ পত্রলেখিকা আয়েষার প্রতি অবিচার করেছেন। কেমন একটা ঈর্ষার ভাব লক্ষিত হচ্ছে। আচ্ছা পড়ো।

দীনবন্ধু ॥ (পত্রপাঠ) "কতলু খাঁর বিলাসকক্ষে বিমলা ছিলো সে রাত্রির আকর্ষণ। হাস্যে লাস্যে নৃত্যে কতলু খাঁকে অভিভূত করিয়া বিমলা

বসনাবৃত ছুরিকা বাহির করিয়া কতলু খাঁর বক্ষস্থলে আমূল বসাইয়া দিয়া স্বামী বীরেন্দ্রসিংহের প্রাণদণ্ডের প্রতিশোধ লইয়া পলায়ন করিল। কতলু খাঁ মৃত্যুকালে জগৎসিংহকে কারামুক্ত করিয়া কাছে আনিলেন এবং মোগল-পাঠানের মধ্যে সন্ধি বিধানের জন্য অন্তিম অনুরোধ জানাইলেন। অন্তিম অনুরোধ উপেক্ষিত হইল না। জগৎসিংহ মোগল-পাঠানের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন। জগৎসিংহ বঙ্গদেশ ত্যাগ করার পূর্বে পাঠান দুর্গে ওসমান প্রভৃতির সহিত দেখা করিতে গেলেন। আয়েষা কিন্তু তাঁহার সহিত দেখা করিলেন না। জগৎসিংহ ফিরিয়া যাইতে-ছিলেন, পথে দেখিলেন ওসমান তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। ওসমান কহিলেন—"

বঙ্কিম ॥ "এ পৃথিবীর মধ্যে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হয় না, একজন এইখানে প্রাণত্যাগ করিব।"

দীনবন্ধু ॥ (বঙ্কিমের প্রতি তাকাইয়া) হ্যাঁ। (পত্রপাঠ) "জগৎসিংহ কহিলেন, 'ওসমান, ক্ষান্ত হও। আমি পরাভব স্বীকার করিলাম। আমি আয়েষার অভিলাষী নহি'।"

বঙ্কিম ॥ "তুমি আয়েষাব অভিলাষী নও; আয়েষা তোমার অভিলাষী। যুদ্ধ কর, ক্ষমা নাই।"

দীনবন্ধু ॥ (পত্রপাঠ) "আমি যুদ্ধ করিব না। তুমি অসময়ে আমার উপকার করিয়াছ। আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।"

বঙ্কিম ॥ (মাটিতে পদাঘাত করিয়া) "যে সিপাহী যুদ্ধ করিতে ভয় পায়, তাহাকে পদাঘাতে যুদ্ধ করাই।"

দীনবন্ধু ॥ (পত্রপাঠ) "তুমুল যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে পরাজিত হইলেন ওসমান। জগৎসিংহ তাঁহার অস্ত্র কাড়িয়া লইলেন। আর একটি কথা না বলিয়া ওসমান অশ্বারোহণে দুর্গের দিকে চলিয়া গেলেন। জগৎসিংহ নিজ শিবিরে ফিরিবার কিছুদিন পর আয়েষার একখানি পত্র পাইলেন। আয়েষা লিখিয়াছে—"

বঙ্কিম ॥ "রাজকুমার, আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নহি, আমি যাহা দিবার তাহা দিয়াছি। তোমার নিকট প্রতিদান কিছু চাহি না।"

[অন্দর দরজায় পুনরায় চুড়ির শব্দ হইল]

দীনবন্ধু ॥ আবার !

বঙ্কিম ॥ আয়েষার প্রেম যখনই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, শব্দটা হচ্ছে তখন। কিন্তু বঙ্কিম—বঙ্কিমই। সে কারো তোয়াক্কা রাখে না। তুমি পড়ে যাও।

দীনবন্ধু ॥ (পত্রপাঠ) "রাজকুমার আর একবার মাত্র তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, মানস আছে। যদি তুমি এ প্রদেশে বিবাহ কর, তবে আমায় সংবাদ দিও; আমি তোমার বিবাহকালে উপস্থিত থাকিয়া, তোমার বিবাহ দিব। তাহাই হইল। আশাভঙ্গে আহতা মুমূর্ষু তিলোত্তমাকে মৃত্যুশয্যা হইতে উদ্ধার করিয়া জগৎসিংহ যখন বিবাহ করিলেন তখন বিবাহোৎসবে যোগ দিতে আসিলেন আয়েষা। তিলোত্তমাকে উপহার দিলেন বহুমূল্য হীরকাদি রত্নরাজি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন,—"

বঙ্কিম ॥ "ভগিনী, তুমি আজ যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাঁহার চরণরেণুতুল্য নহে। তিলোত্তমা! আমি যে রত্নগুলি দিলাম, অঙ্গে পরিও। আর আমার—তোমার সাররত্ন হৃদয়মধ্যে রাখিও।"

দীনবন্ধু ॥ (পত্রপাঠ) "মাগো, তোমার জামাই এইরূপে তাঁহার 'দুর্গেশ-নন্দিনী' নবেল শেষ করিয়াছেন। এই নবেল লিখিতে গিয়া প্রথম দিকে হাস্য-কৌতুক করিয়া আমাকে বলিতেন, আমিই নাকি তাঁহার তিলোত্তমা। আমিই নাকি দুর্গেশনন্দিনী। কিন্তু মা, সম্পূর্ণ নবেলটি পড়িয়া বুঝিতেছি, যাহার নামে নবেল সে দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমা নয়, সে দুর্গেশনন্দিনী পাঠান দুর্গাধিপতি কতলু খাঁর কন্যা আয়েষা। তোমার জামাই আমার সঙ্গে ছলনা করিয়াছেন মাত্র। নবেলটি পড়িলে বুঝিতে কিছুমাত্র বাকি থাকে না যে, তোমার জামাইয়ের প্রিয়পাত্রী কে। বুঝলে মা, সে ঐ বাইশ বছরের মুখপুড়ি আয়েষা।"

বঙ্কিম ॥ সর্বনাশ!

দীনবন্ধু ॥ হ্যাঁ বৎস, সর্বনাশ। প্রথমতঃ দ্বিতীয় পক্ষ, দ্বিতীয়তঃ পক্ষপাতিত্বের এই অভিযোগ। তোমাকে একবার বলতে হবে বাঁকাচাঁদ, গ্রন্থের 'দুর্গেশ-নন্দিনী'-নামকরণ কাকে লক্ষ্য করে করেছো, কাকে দিয়েছো ঐ সম্মানের আসন? দুর্গেশনন্দিনী তো দুজনেই।

বঙ্কিম ॥ আমি কেন বলবো? বলবেন পাঠকেরা। আমার যা লেখবার লিখেছি। আমার কাজ শেষ।

দীনবন্ধু ॥ বেশ, ওঁদের আমি তাই জানাবো। কিন্তু তাতে পরিত্রাণ পাবে বলে মনে হচ্ছে না। মনে রেখো, একে দ্বিতীয় পক্ষ, তাতে আবার এই অভিযোগ। (ঘড়ি দেখিয়া) এবার আমি উঠি। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) চিঠিখানা পড়ে একটা আনন্দ আমি পেয়েছি বঙ্কিম।

বঙ্কিম ॥ কি ?

দীনবন্ধু ॥ তোমার বইয়ের তিলোত্তমাটি পুতুল কিন্তু ঘরের তিলোত্তমাটি মানুষ। পুতুল নিয়ে খেলা চলে, কিন্তু মানুষ নিয়ে নয়।

[উভয়ের উচ্চহাস্য। দীনবন্ধু চিঠিখানি পকেটে পুরিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।]

বঙ্কিম ॥ তাই দেখছি। তলে তলে এত সব ব্যাপার ঘটেছে, এ আমি জানতাম না দীনুভাই। 'দুর্গেশনন্দিনী' বইটি ছাপাখানা থেকে আমার হাতে এলেই প্রথম কাপি আমি বড়দার হাতে দি। কারণ বইটি উৎসর্গ করেছি তাঁকে। কিন্তু দ্বিতীয় কাপিটি আমাব হৃদয়লক্ষ্মীর হাতেই উপহার দিয়েছিলাম। কিন্তু আনন্দের সে উচ্ছ্বাস দেখলাম না—যেটা দেখবো বলে আশা করেছিলাম।

দীনবন্ধু ॥ আকাশটি মেঘাচ্ছন্ন ছিলো ?

বঙ্কিম ॥ হ্যাঁ।

দীনবন্ধু ॥ মেঘগর্জন হয়েছিল ?

বঙ্কিম ॥ না। তেমন না।

দীনবন্ধু ॥ বর্ষণ হয়েছিল ?

বঙ্কিম ॥ এখন মনে হচ্ছ হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম আনন্দাশ্রু, আজ বুঝেছি সেটা ছিলো—

দীনবন্ধু ॥ শোকাশ্রু। সাবধান, বঙ্কিম, খুব সাবধান!

[দীনবন্ধু দরজা খুলিয়া রাজলক্ষ্মীকে ডাকিতে লাগিলেন—]

দীনবন্ধু ॥ কই গো, আমার মা লক্ষ্মী কোথায় ?

[রাজলক্ষ্মী দরজার আড়াল হইতেই বলিলেন—]

রাজলক্ষ্মী ॥ আমি দরজাতেই দাঁড়িয়ে আছি মেসোমশাই।

বঙ্কিম ॥ ও বাবা!

[রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ]

রাজলক্ষ্মী ॥ দরজা বন্ধ করে এতক্ষণ আপনারা ছিলেন কি করে? চা চাইলেন না, তামাক না।

দীনবন্ধু ॥ এই একটু গোপনীয় আলোচনা ছিল তাই।

রাজলক্ষ্মী ॥ রাজকার্য?

দীনবন্ধু ॥ (বঙ্কিমের মুখের দিকে তাকাইয়া) হ্যাঁ, রাজকায। তা আমি এখন যাচ্ছি লক্ষ্মী। দু'দিন খুব আনন্দ করে গেলাম। খুশী হয়েছো তো?

রাজলক্ষ্মী ॥ দু'দিনের জায়গায় তিন দিন হলে আরো খুশী হতাম। থেকে যান না আজকের দিনটা। আমার কিছু জিজ্ঞাসা ছিলো আপনার কাছে।

দীনবন্ধু ॥ কি জিজ্ঞাস্য?

রাজলক্ষ্মী ॥ ওর ঐ 'দুর্গেশনন্দিনী' বইটা নিয়ে। আচ্ছা, দুর্গেশনন্দিনী কে? তিলোত্তমা না আয়েষা?

দীনবন্ধু ॥ স্বয়ং গ্রন্থকাব যখন তোমাব ঘরে, এ প্রশ্ন তুমি তাঁকেই করো সঠিক উত্তর পাবে। আমাব আর থাকবাব উপায় নেই মা।

[বাজলক্ষ্মী দীনবন্ধুকে প্রণাম করিলেন।]

দীনবন্ধু ॥ চিরায়ুষ্মতী হও। বাংলাভাষার প্রথম সার্থক উপন্যাস লিখেছেন তোমার স্বামী। স্বামীগর্বে গরবিনী হও। চলি—। পূর্ণের সঙ্গে আর দেখা হলো না। সেই যে কোথায় বেরিয়ে গেল, এখনও ফিরলো না। পূর্ণ কলকাতায় গেলে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।

বঙ্কিম ॥ আজ-কালই যাবে। ওব একটা ভালো চাকরি হবার সম্ভাবনা হয়েছে। আবার এ আকাশে উদয় হচ্ছো কবে?

দীনবন্ধু ॥ সেটা আকাশের অবস্থার উপরই নির্ভব করে। চিঠি দিয়ো কিন্তু।

বঙ্কিম। দেব, দেব।

রাজলক্ষ্মী ॥ শ্বশুরবাড়ি গেলে আমার বাপের বাড়ি যেতে ভুলবেন না মেসোমশাই। বাবা লিখেছেন, আপনার নাকি শীগগির যাবার কথা আছে।

দীনবন্ধু ॥ (বঙ্কিমের দিকে চাহিয়া) তা আছে বটে। চলি। শুভমস্তু!

[পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ]

পূর্ণচন্দ্র ॥ একি, আপনি চলে যাচ্ছেন?

দীনবন্ধু ॥ হ্যাঁ পূর্ণ। তুমি ফিরতে এত দেরি করলে—তা যাক, কলকাতায় তো যাচ্ছো, দেখা ক'রো।

বঙ্কিম ॥ (পূর্ণকে) চৌধুরী সাহেব আছেন?

পূর্ণচন্দ্র ॥ হ্যাঁ সেজদা। (দীনবন্ধুকে) চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।

বঙ্কিম ॥ না পূর্ণ। চৌধুরী সাহেব যখন আছেন, তাঁর একটু অভ্যর্থনার আয়োজন কর তোমরা। আমি দীনুদাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসছি। এসো—

[বঙ্কিম ও দীনবন্ধু বাহিরে প্রস্থান]

রাজলক্ষ্মী ॥ চৌধুরী সাহেবটি কে?

পূর্ণচন্দ্র ॥ পাশের গ্রামের খুব এক ধনী মুসলমান জমিদার।

রাজলক্ষ্মী ॥ তিনি আসছেন কেন?

পূর্ণচন্দ্র ॥ কেন, সেজদা তোমাকে বলেনি?

রাজলক্ষ্মী ॥ না তো!

পূর্ণচন্দ্র ॥ গেল বছর সেজদা যখন এই বারুইপুরে প্রথম বদলী হয়ে আসেন, তখন অক্টোবর মাসে পাশের ঐ গ্রামে ভীষণ একটা সাইক্লোন হয়।

রাজলক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ, শুনেছি। আমি তখন ছিলাম কাঁঠালপাড়ায়।

পূর্ণচন্দ্র ॥ অমন ঝড়বৃষ্টি বহুকাল নাকি এ অঞ্চলে হয়'নি। বহুলোকের ঘর বাড়ি পড়ে যায়, বহু গরু বাছুর মারা যায়। বেশকিছু লোকও মারা যায়। কত লোক যে আশ্রয়হীন হয়, তার নাকি হিসাব ছিল না।

রাজলক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ, তাও শুনেছি। আমি কাঁঠালপাড়ায় হঠাৎ ওঁর এক চিঠি পেলাম, অসুস্থ শরীর নিয়েই সরকারী সাহায্য দিতেতিনি ওখানে চলে যাচ্ছেন। পরের এক চিঠিতে জেনেছিলাম, অসুস্থ শরীরে ভীষণ পরিশ্রমে তাঁর জ্বরও হয়েছিল। কিন্তু উনি যাওয়াতে প্রজারা নাকি দু'হাত তুলে ওঁকে আশীর্বাদ করেছিল।

পূর্ণচন্দ্র ॥ প্রজাদের সেই সর্বনাশের সময় সেজদাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলেন যিনি তিনি হচ্ছেন এই বৃদ্ধ মুসলমান জমিদার সামসুদ্দিন চৌধুরী।

রাজলক্ষ্মী ॥ (হাসিয়া) কিন্তু সাইক্লোন তো কবে শেষ হয়ে গেছে। আজ আবার তাঁকে কেন?

পূর্ণচন্দ্র॥ সেজদা লাটসাহেবকে এই সাইক্লোনে সরকারী সাহায্যের একটা রিপোর্ট পাঠান। তাতে এই চৌধুরী সাহেবের বিশেষ সাহায্যের কথা উল্লেখ ছিল। এতদিন পর লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী এক পত্রে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, শুধু সেজদাকে নয় সেজদার মারফত এই চৌধুরী সাহেবকেও। আজ আমি ওদিকে বেড়াতে যাব শুনে সেজদা বললেন লোকটির খবর নিতে। লোকটি কিন্তু অদ্ভুত। আমি গিয়ে সব বললাম। বুড়ো বিশেষ কোনো কথা বললেন না। স্পষ্ট দেখলাম, তাঁর দু'চোখ জলে ভরে গেল। মুখে শুধু বললেন—হুজুরকে আসতে হবে না, আমিই যাচ্ছি।...ঐ বোধ হয় ওঁরা এসে গেলেন। এসো বৌদি একটু চা জল-খাবারের আয়োজন করি।

[রাজলক্ষ্মী ও পূর্ণচন্দ্রের অন্দরে প্রস্থান। বৃদ্ধ সামসুদ্দিন চৌধুরীকে লইয়া বঙ্কিম বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।]

বঙ্কিম॥ আসুন চৌধুরী সাহেব, বসুন।

[চৌধুরী সাহেবের বার্ধক্য-জীর্ণ দেহ কাঁপিতেছিল। বঙ্কিম তাঁহাকে ধরিয়া একটি আসনে বসাইলেন।]

বঙ্কিম॥ দেহের অবস্থা দেখছি একেবারেই ভালো নয়!

সামসুদ্দিন॥ খোদা এখন পায়ে টেনে নিলেই বাঁচি। বলুন হুজুর, তলব কেন?

বঙ্কিম॥ গেল বছর ৫ই অক্টোবর সেই যে আপনাদের ও অঞ্চলে সাইক্লোন হয়েছিল—দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করতে আপনার estate থেকে যে সাহায্য পেয়েছিলাম, আমি তা লাটসাহেবকে জানিয়েছিলাম। লাটসাহেব খুশী হয়ে আপনাকেও ধন্যবাদ জানাতে লিখেছেন আমাকে।

সামসুদ্দিন॥ ধন্যবাদ কাকে জানাবেন? আমি তো তখন এখানে ছিলাম না। চোখের চিকিৎসার জন্য ছিলাম কলকাতায়।

বঙ্কিম॥ আপনি ছিলেন না বটে, কিন্তু আপনার লোকজন খুবই সাহায্য করেছিল। বিশেষ করে আপনার মেয়ে।

সামসুদ্দিন॥ (কাঁপিয়া উঠিয়া) হ্যাঁ, আমার মেয়ে।

[বৃদ্ধ আর কিছু বলিতে পারিলেন না।]

বঙ্কিম॥ দেখলাম আপনার সেই মেয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে দিলেন

আশ্রয়হীনদের আশ্রয় দিতে। শুধু আশ্রয় দিলেন না অন্নও দিলেন, যতদিন দরকার ছিলো। ও অঞ্চলে আর পাকা বাড়ি না থাকায়, রিলিফের অফিসও বসিয়েছিলাম আপনার বাড়িতে।

সামসুদ্দিন ॥ মেহেরবানি করে আপনি নিজেও আমার গরীবখানায় তিন চার দিন ছিলেন এতে আমরা ধন্য হুজুর, ধন্য। না জানি কত গোস্তাকি হয়েছিল আমার মেয়ের, সে সব ভুলে গিয়ে তাকে মাপ করবেন হুজুর!

বঙ্কিম ॥ মাপ করবো কি চৌধুরী সাহেব। ওখানে গিয়ে হলো আমার প্রবল জর। জরে আমি অচেতন হয়ে পড়েছিলাম। একদিন জ্ঞান হতে দেখি, আমার মাথার পাশে তিনি বসে হাওয়া করছেন। জ্ঞান হয়েছে দেখে ওষুধ খাওয়ালেন। সে সব কথা ভুলবো না। ঐ সাইক্লোনের পরেই আমি এখান থেকে বদলী হয়ে ডায়মণ্ড হারবারে চলে যাই। তখনও আপনি কলকাতা থেকে ফেরেননি তাই আপনার মেয়ের এই মহানুভবতার কথা বলে যেতে পারিনি। বদলী হয়ে জেনেছিলাম, আপনারা কেউ এখানে ছিলেন না। আপনিও না—আপনার মেয়েও না।

সামসুদ্দিন ॥ (উদ্গত অশ্রু বোধ করিয়া) মেয়েটার চিকিৎসার জন্য তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম কলকাতায়। মেয়েটার স্বাস্থ্য কোনদিনই ভালো ছিল না। এই অসুখের জন্যই বাইশ বছর বয়সেও মেয়েটাকে বিয়ে দিতে পারিনি।

বঙ্কিম ॥ কি অসুখ, জানতে পারি কি?

সামসুদ্দিন ॥ শেষটায় তো দাঁড়িয়ে গেল যক্ষ্মায়।

বঙ্কিম ॥ যক্ষ্মা?

সামসুদ্দিন ॥ যক্ষ্মা। দেখতে দেখতে ভেতরে ভেতরে ক্ষয় হতে লাগলো।

বঙ্কিম ॥ চিকিৎসায় কোনো ফল পাওয়া যায়নি?

সামসুদ্দিন ॥ কিছু বুঝলাম না। মাস দুই আগে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম বাড়ি। বাড়ি ফিরে কথাবার্তা বন্ধ করে দিল। রাতদিন পড়তো শুধু বই।

বঙ্কিম ॥ লেখাপড়ার প্রতি তাঁর অনুরাগ আমিও দেখেছি। এমন মেয়ের অমন অসুখ হলো। শুনুন চৌধুরী সাহেব, আমার একটা নবেল বেরিয়েছে —নাম "দুর্গেশনন্দিনী"।

সামসুদ্দিন ॥ আমি ওর মুখেই তা শুনেছি। কলকাতা থেকে আসবার সময় কিনেও এনেছিল ঐ বই।

বঙ্কিম ॥ না না, কিনলেন কেন? আমি ওঁকে একটা বই উপহার দিচ্ছি। (র‍্যাক হইতে একটি বই টানিয়া লইয়া) ওঁর নাম নিজে লিখে দিচ্ছি। কি যেন ওঁর নাম?

সামসুদ্দিন ॥ ডাকনাম ফুলি।

বঙ্কিম ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুলি—ফুলবিবি।

সামসুদ্দিন ॥ কিন্তু একটা পোশাকী নামও—

বঙ্কিম ॥ কি?

সামসুদ্দিন ॥ আয়েষা বিবি।

বঙ্কিম ॥ অ্যাঁ!

সামসুদ্দিন ॥ হ্যাঁ। কিন্তু এ নামটা আমাদের দেওয়া নয়। আপনি দিয়েছিলেন কি?

বঙ্কিম ॥ (আপন মনে) আয়েষা—আয়েষা—জ্বরের ঘোরে এ নাম আমি দিয়েছিলাম না সে আমাকে বলেছিল! কি জানি! মনে করতে পারছি না—আশ্চর্য। (বইটিতে নাম লিখিতে কলম ধরিলেন) আয়েষা চৌধুরী —চৌধুরী? না চৌধুরানী?

সামসুদ্দিন ॥ কিন্তু আর লিখে কি করবেন? কে পড়বে?

বঙ্কিম ॥ কেন? একথা বলছেন কেন?

সামসুদ্দিন ॥ সে আর নেই।

বঙ্কিম ॥ নেই!!

সামসুদ্দিন ॥ পরশু রাতে সে আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে চলে গেছে।

[ক্ষণকাল নিস্তব্ধতা। কেহই কোনো কথা বলিতে পারিলেন না।]

সামসুদ্দিন ॥ (বুকভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) ওহো-হো হো—আচ্ছা আমি চলি।

[উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বঙ্কিম তাঁহাকে ধরিলেন। পূর্ণচন্দ্র নিজেই একখানি ট্রেতে করিয়া চা ও সন্দেশ লইয়া আসিলেন। রাজলক্ষ্মীকে দরজায় দণ্ডায়মানা দেখা গেল।]

পূর্ণচন্দ্র ॥ সেজদা, চা।

বঙ্কিম ॥ থাক্‌, দরকার নেই

[চৌধুরী সাহেবকে লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাহির হইয়া গেলেন। রাজলক্ষ্মী পূর্ণচন্দ্রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

পূর্ণচন্দ্র ॥ ব্যাপার কি বুঝছি না তো বৌঠান !

রাজলক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে।

পূর্ণচন্দ্র ॥ কেন, ঐ মুসলমান জমিদারের একটি যুবতী মেয়ে আছে বলে ?

রাজলক্ষ্মী ॥ তা আবার তুমি কার কাছে শুনলে ?

পূর্ণচন্দ্র ॥ কেন, সেজদা তোমাকে একথা বলেননি ?

রাজলক্ষ্মী ॥ না তো, ঠাকুরপো।

পূর্ণচন্দ্র ॥ আমাকে কিন্তু বলেছিলেন।

রাজলক্ষ্মী ॥ আমাকে কিন্তু বলেননি।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

পূর্ণচন্দ্র ॥ তোমাকে বলেননি কেন, বুঝতে পারছি না বৌঠান।

রাজলক্ষ্মী ॥ আমি কিন্তু বুঝতে পারছি ঠাকুরপো।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

পূর্ণচন্দ্র ॥ সেজদার কাছে শুনেছিলাম মেয়েটি সাইক্লোনে নিরাশ্রয়দের সেবা-শুশ্রূষা করেছিল, এ তো ভালো কথা। কিন্তু তোমাকে তা না বলবার কারণ তো কিছু দেখছি না।

রাজলক্ষ্মী ॥ কিছুটা কারণ আমি দেখছি। রিলিফ দিতে গিয়ে তোমার সেজদা ঐ জমিদার বাড়িতেই কয়েকদিন ছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র ॥ হ্যাঁ, সেজদা তাও বলেছেন।

রাজলক্ষ্মী ॥ ওঁর তখন প্রবল জ্বর হয়।

পূর্ণচন্দ্র ॥ তাও শুনেছি। দাঁড়াও দাঁড়াও। আচ্ছা বৌঠান ওঁর সেবাশুশ্রূষা কে করেছিল তোমাকে বলেননি কি ?

রাজলক্ষ্মী ॥ না।

পূর্ণচন্দ্র ॥ হুঁ। [ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

রাজলক্ষ্মী ॥ তোমার দাদাও ছিলেন আহত। জ্বরাহত।

পূর্ণচন্দ্র ॥ জ্বরাহত ! হ্যাঁ, তা বলতে পারো বৈকি !

রাজলক্ষ্মী ॥ জগৎসিংহও ছিলেন আহত, তাঁরও সেবাশুশ্রূষা করেছিল মুসলমান নবাব নন্দিনী পোড়ারমুখী আয়েষা।

পূর্ণচন্দ্র ॥ হ্যাঁ, আয়েষা। এই জমিদারনন্দিনীই কি তবে সেই আয়েষা?

রাজলক্ষ্মী ॥ কি জানি, কি করে বলবো? আমি তো আর তাকে দেখিনি! দুর্গেশনন্দিনীতে যে আয়েষাকে আমরা দেখেছি, তোমার সেজদা তার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, তিলোত্তমা পরমা রূপবতী কিন্তু, যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকার মধ্যে তেমনি আয়েষা।

পূর্ণচন্দ্র ॥ আমার তো এতদিন মনে হয়েছিলো, তোমাকে দেখেই সেজদা এঁকেছেন তাঁর তিলোত্তমা।

রাজলক্ষ্মী ॥ সে তিনি নিজ মুখেও আমাকে বলতে লজ্জা পাননি। কিন্তু তিলোত্তমার চেয়েও যাকে বড় আসন দিয়েছেন সেই আয়েষাটি কাকে দেখে যে এঁকেছেন, সেটা খুঁজে মরছিলাম। আজ মনে হচ্ছে সেই পদ্মফুলটির সন্ধান পেয়েছি ঠাকুরপো।

পূর্ণচন্দ্র ॥ হুঁ। আর জগৎসিংহ? তার মধ্যে কি সেজদাই লুকিয়ে আছেন বৌঠান?

রাজলক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ। এতদিন তাই মনে হতো, আর তা মনে করে আনন্দও পেতাম। কিন্তু ঠাকুরপো—

পূর্ণচন্দ্র ॥ বল, বৌঠান।

রাজলক্ষ্মী ॥ আজ সেটা মনে করতে কেন যেন আনন্দ হচ্ছে না ঠাকুরপো!

পূর্ণচন্দ্র ॥ সেজদা ফিরে আসছেন মনে হচ্ছে।

রাজলক্ষ্মী ॥ (চুপিচুপি) এসব কথা তুলো না। (প্রকাশ্যে) কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে তোমার সেজদা তবে এই 'দুর্গেশনন্দিনী'র পাণ্ডুলিপি অনেককেই শুনিয়েছিলেন!

পূর্ণচন্দ্র ॥ হ্যাঁ তা শুনিয়েছিলেন।

[উদ্‌ভ্রান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবেশ]

বঙ্কিম ॥ স্বপ্ন! সবই স্বপ্ন!

রাজলক্ষ্মী ॥ কি আবার স্বপ্ন?

বঙ্কিম ॥ এক চাষীর একমাত্র পুত্র মারা গেল। চাষী তখন জমি চষছে মাঠে। স্ত্রী খবর পাঠালো ছেলে মারা গেছে, শীগগির এসো।

[রাজলক্ষ্মী পূর্ণের দিকে বিস্মিত চোখে তাকাইলেন।]

বঙ্কিম ॥ কিন্তু চাষী এল না। সারাদিন জমি চাষ করে সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফিরলো। তখন চিতার আগুন নিভে গেছে।

[রাজলক্ষ্মী পূর্ণকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার অর্থ কি। পূর্ণ কিছু বলিতে পারিলেন না।]

বঙ্কিম ॥ স্ত্রী স্বামীকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো। বললো, একমাত্র ছেলে মরে গেল, খবর পাঠালাম—দেখতে এলে না একবার। তুমি কি পাষাণ?

[রাজলক্ষ্মী ও পূর্ণ সবিস্ময়ে বঙ্কিমের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।]

বঙ্কিম ॥ চাষী তখন স্ত্রীকে বললো, ক্ষেপি, শোন। আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। দেখেছিলাম আমি যেন এক রাজা। সাত সাতটি রানী। শ'খানিক সন্তান। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া। সৈন্যসামন্ত লোকলস্কর। কিছুরই অভাব নেই। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। তা কিনা হঠাৎ এমন স্বপ্নটা ভেঙে গেল। এখন দেখছি আমি কিনা এক গরীব চাষী, একটি মাত্র ছেলে তাও মারা গেল। আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছি না—আমি বুঝছি না—

রাজলক্ষ্মী ॥ কি?

বঙ্কিম ॥ কোন্‌টা স্বপ্ন—কোন্‌টা সত্য? রাজা হওয়াটাই স্বপ্ন না চাষী হওয়াটাই স্বপ্ন? কোন্‌টা স্বপ্ন আর কোন্‌টা সত্য? বুঝবো তবে কাঁদবো।

রাজলক্ষ্মী ॥ এসব কথা কেন?

বঙ্কিম ॥ কোন্‌টা স্বপ্ন কোন্‌টা সত্য—বুঝবো তবে তো কাঁদবো।

পূর্ণচন্দ্র ॥ (চীৎকার করিয়া) সেজদা! এসব তুমি কি বলছ?

বঙ্কিম ॥ (প্রকৃতিস্থ হইয়া) কি সব বলছি?

পূর্ণচন্দ্র ॥ কোন চাষীর ছেলে মারা গেছে—এই সব?

বঙ্কিম ॥ ও, না না। হঠাৎ একটা গল্প মনে পড়ে গেল তাই বলছিলাম। তোমরা কি আলাপ করছিলে?

পূর্ণচন্দ্র ॥ আমি বলছিলাম ভাটপাড়ার পণ্ডিতরাও শুনেছেন।

বঙ্কিম ॥ কি শুনেছেন?

পূর্ণচন্দ্র ॥ দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি। সেই যে তুমি কাঁঠালপাড়ায় পড়ে শুনিয়েছিলে।

বঙ্কিম ॥ হ্যাঁ। পড়ছিলাম, আর একজন পণ্ডিত মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠছিলেন "আ মরি, আ মরি! কি বক্তৃতাই করিতেছেন"।

[বঙ্কিমচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজলক্ষ্মী ও পূর্ণও।]

বঙ্কিম ॥ গল্পপাঠ শেষ হলে আমি জিগ্যেস করেছিলাম, ভাষায় ব্যাকরণদোষ আছে কি? তাতে মধুসূদন স্মৃতিরত্ন কি বলেছিলেন মনে আছে পূর্ণ?

পূর্ণচন্দ্র ॥ হ্যাঁ, বেশ মনে আছে। তিনি বললেন, গল্প ও ভাষার মোহিনী-শক্তিতে আমরা এতই আকৃষ্ট ছিলাম যে আমাদের সাধ্য কি যে অন্য দিকে মন নিবিষ্ট করি। কিন্তু ছাপা দুর্গেশনন্দিনী পড়ে কলকাতার সংস্কৃত-ওয়ালারা খড়্গহস্ত হয়েছেন।

বঙ্কিম ॥ তা হোন, কিন্তু ইংরেজিওয়ালারা আবার দু'হাত তুলে বাহবা দিচ্ছেন।

পূর্ণচন্দ্র ॥ তা দিচ্ছেন, কিন্তু অনেকে আবার বলছেন, দুর্গেশনন্দিনী নাকি স্কটের 'আইভ্যান হো'র ছায়া।

বঙ্কিম ॥ দুর্গেশনন্দিনী লিখবার আগে 'আইভ্যান হো' আমি পড়িনি। লিখবার পর পড়েছি। তোমারও তা দেখেছো।

রাজলক্ষ্মী ॥ কিন্তু আমাদের অনেকের জীবনের ছায়া ওতে পড়েনি কি?

[বঙ্কিম হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন।]

বঙ্কিম ॥ বাস্তব জীবনের ছায়া নিয়েই সাহিত্য গড়ে ওঠে। কথাসাহিত্য তো বটেই। উপন্যাসের মধ্যে মানুষ যদি নিজেকে খুঁজে না পায় তবে তা কখনো সার্থক হয় না।

পূর্ণচন্দ্র ॥ তোমরা কথা বলো, আমি চা দেখছি।

বঙ্কিম ॥ রামুটা গেল কোথায়?

[কলিকাতে ফুঁ দিতে দিতে রামুর প্রবেশ]

রামু ॥ এই যে কত্তা।

[রামু তামাক পরিবেশন করিল।]

রামু ॥ সেবন করুন কত্তা।

বঙ্কিম ॥ সেবন করুন কত্তা! আমার বিদ্যাদিগ্‌গজ!

[রামু হাসিমুখে অন্দরে গেল।]

পূর্ণচন্দ্র ॥ ও বাবা, এবার দেখছি ছায়া খোঁজার পালা। কার ছায়া কাতে পড়েছে, ওরে বাবা, আমি সরে পড়ছি।

[হাস্যমুখে পূর্ণচন্দ্রের অন্দরে প্রস্থান]

রাজলক্ষ্মী ॥ তোমার দুর্গেশনন্দিনীতে পূর্ণচন্দ্রের ছায়াও পড়েছে নাকি?

বঙ্কিম ॥ পূর্ণচন্দ্রের ছায়া পড়বে না কেন? তবে এ পূর্ণচন্দ্রের নয়।

রাজলক্ষ্মী ॥ তবে কোন্ পূর্ণচন্দ্র?

বঙ্কিম ॥ আকাশের।

রাজলক্ষ্মী ॥ কার মুখে?

বঙ্কিম ॥ কেন, তিলোত্তমার।

রাজলক্ষ্মী ॥ কিন্তু সে তো পূর্ণচন্দ্রের নয়। তুমি লিখেছো, "তিলোত্তমাও রূপে আলো করিতেন—সে বালেন্দুজ্যোতির ন্যায়, সুবিমল, সুমধুর, সুশীতল; কিন্তু তাহাতে গৃহকার্য হয় না, তত প্রখর নয়, এবং দূর-নিঃসৃত।"

বঙ্কিম ॥ ঠিক যেন তুমি।

[বঙ্কিম রাজলক্ষ্মীর হাত ধরিলেন। একটি স্তব্ধ মুহূর্তের পর রাজলক্ষ্মী হাতখানি সরাইয়া লইলেন।]

রাজলক্ষ্মী ॥ তুমি লিখেছো—"আয়েষাও রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে পূর্বাহ্নিক সূর্য-রশ্মির ন্যায়; প্রদীপ্ত প্রভাময়, অথচ যাহাতে পড়ে, তাহাই হাসিতে থাকে। যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকামধ্যে তেমনি আয়েষা।" ওগো, এই আয়েষাটি কে? কার ছায়া? [ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

বঙ্কিম ॥ (গম্ভীরভাবে) এ প্রশ্নটা আজ থাক।

রাজলক্ষ্মী ॥ বেশ, থাক। কিন্তু জগৎসিংহ তো তুমি?

বঙ্কিম ॥ কি জানি। তোমার কি মনে হয়?

রাজলক্ষ্মী ॥ আমার তো মনে হয়, তুমি।

বঙ্কিম ॥ আমি! কখনো কখনো তা মনে হয় বটে, কিন্তু, না, আমি না। এই তিলোত্তমাটিকে না হয় আমি দর্শনমাত্রেই ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু জগৎসিংহ যুদ্ধ করেছিলেন। আমি আবার যুদ্ধ করলাম কবে?

রাজলক্ষ্মী ॥ নীলকরদের সঙ্গে তুমি লড়াই করোনি? খুলনায়? যখন এই উপন্যাস লিখছিলে?

বঙ্কিম ॥ (খুশী হইয়া) হ্যাঁ। তখন সত্যি মনে হতো লক্ষ্মী, আমিই যেন জগৎসিংহ, তুমিই যেন তিলোত্তমা। যে কুঠিতে আমরা ছিলাম, সে কুঠি যেন ছিল গড়মান্দারণ দুর্গ। নীলকর সাহেব যেদিন আমাকে আক্রমণ করতে এলো, সে দিন আমার মনে হয়েছিল, ঐ সাহেব যেন ওসমান। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তারপর তো আর কিছু মেলে না লক্ষ্মী। আমার জগৎসিংহ ওসমানের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল, কিন্তু তোমার জগৎসিংহ ওসমানকে হারিয়ে দিয়েছিল।

রাজলক্ষ্মী ॥ তা বটে। পরে কিন্তু আবার মিলছে।

বঙ্কিম ॥ কোথায়?

রাজলক্ষ্মী ॥ তোমার আহত জগৎসিংহকে সেবাশুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলেছিলেন পাঠান রাজকন্যা আয়েষা!

বঙ্কিম ॥ হ্যাঁ।

রাজলক্ষ্মী ॥ আর সাইক্লোনের পরে আমার জ্বরাহত জগৎসিংহকে সেবাশুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেননি কি এক মুসলমান জমিদারনন্দিনী?

[রাজলক্ষ্মী বঙ্কিমের চোখে চোখে চাহিয়া রহিলেন।]

বঙ্কিম ॥ (চোখ নীচুতে নামাইয়া) হ্যাঁ। তুলেছিলেন।

রাজলক্ষ্মী ॥ মিলছে?

বঙ্কিম ॥ হ্যাঁ, কিছুটা মিলছে।

রাজলক্ষ্মী ॥ এই মুসলমান জমিদারনন্দিনীর নামটি কি ছিলো জানতে পারি কি? (বঙ্কিমের নীরবতা) মেয়েটির বুঝি কোনো নাম ছিলো না?

বঙ্কিম ॥ নাম থাকবে না কেন, ছিলো। আমি জানতাম ফুলবিবি। কিন্তু আজ তার পিতার কাছে অদ্ভুত আশ্চর্য এক সংবাদ পেলাম। তার পোশাকী নাম ছিলো নাকি আয়েষা।

রাজলক্ষ্মী ॥ আয়েষা?

বঙ্কিম ॥ হ্যাঁ, আয়েষা।

রাজলক্ষ্মী ॥ এ নাম সে তোমাকে বলেনি?

বঙ্কিম ॥ বলে থাকতে পারে কিন্তু জ্বরের ঘোরে আমি হয়তো মনে রাখতে পারিনি। সত্যি বলছি লক্ষ্মী, আমার স্মরণ হয় না। কেবলি মনে হচ্ছে এসব স্বপ্ন—এসব স্বপ্ন। কিন্তু এত প্রশ্ন কেন, লক্ষ্মী?

রাজলক্ষ্মী ॥ তুমি এত বোঝ, আর মেয়েদের মন বোঝ না?

বঙ্কিম ॥ কিন্তু লক্ষ্মী, গোটা দুর্গেশনন্দিনী নভেলখানিতে তুমি কোনোখানে দেখাতে পারো, তিলোত্তমার প্রেম বিস্মৃত হয়ে জগৎসিংহ আসক্ত হয়েছেন আয়েষাতে ?

[নিস্তব্ধতা]

বঙ্কিম ॥ আমার 'দুর্গেশনন্দিনী' বইখানি তো তোমার মুখস্থ। উত্তর দাও লক্ষ্মী।

[রাজলক্ষ্মী নীরব রহিলেন।]

বঙ্কিম ॥ পারবে না। তিলোত্তমা! তবে এ ঈর্ষা কেন ?

রাজলক্ষ্মী ॥ বেশ। দুর্গেশনন্দিনী তো দেখছি দু'জন। তিলোত্তমাও দুর্গেশনন্দিনী, আয়েষাও দুর্গেশনন্দিনী। বইয়ের নামকরণ করছো তবে কাকে উদ্দেশ্য করে ?

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

বঙ্কিম ॥ এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে চাই না লক্ষ্মী। পাঠকরা দিক।

রাজলক্ষ্মী ॥ বেশ, তাই না হয় দেবে। কিন্তু ওগো, তবু আমার একটা ইচ্ছা থেকে যাচ্ছে।

বঙ্কিম ॥ কি ?

রাজলক্ষ্মী ॥ তোমার এই মুসলমান জমিদারনন্দিনীটিকে আমাকে একবার দেখাও।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

রাজলক্ষ্মী ॥ দেখাবে না ?

বঙ্কিম ॥ সে নেই।

রাজলক্ষ্মী ॥ নেই ? মানে ?

বঙ্কিম ॥ তার ছিল যক্ষ্মারোগ। গত পরশু সবাইকে ফাঁকি দিয়ে সে স্বর্গে চলে গেছে। সে নেই।

রাজলক্ষ্মী ॥ নেই ?

বঙ্কিম ॥ না। [নিস্তব্ধতা]

রাজলক্ষ্মী ॥ ওঁকে আমি হিংসা করছিলাম।

বঙ্কিম ॥ হিংসা! কেন ?

রাজলক্ষ্মী ॥ ও তোমার আয়েষা।

বঙ্কিম ॥ না। ওকে দেখার আগেই এসেছিল আমার আয়েষা। বরং

আমি অবাক হয়েছিলাম, ওর মধ্যে কি আশ্চর্যভাবে পড়েছিল আয়েষার ছায়া। কিন্তু এতেই বা তোমার হিংসা হবে কেন?

রাজলক্ষ্মী ॥ না, আর হিংসা হচ্ছে না। বরং ইচ্ছে হচ্ছে—

বঙ্কিম ॥ কি?

রাজলক্ষ্মী ॥ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে একটি প্রণাম রাখি।

বঙ্কিম ॥ কেন?

রাজলক্ষ্মী ॥ আয়েষাকে তুমি অনেক বড করে এঁকেছো। এ জগতে থেকেও সে যেন এ জগতের নয়। কোন স্বার্থ নেই, কোন হিংসা নেই তাঁর মনে। তিলোত্তমার ওপরই বা তাঁর কত দয়া! আমি কি ভাবতাম জানো?

বঙ্কিম ॥ কি?

রাজলক্ষ্মী ॥ আমার মনে হতো ও চরিত্রটি অবাস্তব। অমন কোনো লোক হয় না—হতে পারে না। নিছক কল্পনার খেয়ালে গডে তুলেছো অতবড চরিত্র। তাই ভাবতাম মনের খেয়ালেই যদি ওকে অমন গডলে তবে তিলোত্তমা কি দোষ করলো; তাকে কেন গডলে না অতবড় করে? তাই হিংসা হতো আমার। কিন্তু—

বঙ্কিম ॥ কিন্তু?

রাজলক্ষ্মী ॥ এখন দেখছি, আয়েষা একেবারে কল্পনা নয়। এ দুনিয়ায় আয়েষা আছে। আর যখন তা রয়েছে, সে আমার নমস্য—আমার নমস্য।

বঙ্কিম ॥ মিথ্যা বলোনি। যতটুকু তাকে দেখেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল সার্থক আমার কল্পনা। দুঃখ এই অকালে ঝরে পড়লো এই পদ্মফুল। কেমন বিশ্বাস হচ্ছিলো না। মনে হচ্ছিলো, সে যে গেছে সেটা স্বপ্ন, না আমরা যে রয়েছি এটা স্বপ্ন?

রাজলক্ষ্মী ॥ তোমার কল্পনা, তোমার জগৎ, সে যে কত বড, কত উর্ধ্বে, ভেবে পাই না আমি। কখনো মেপে উঠতে পারলাম না আমি তোমাকে। এ যে আমার কত বড় দুঃখ আমিই জানি। লেখকের স্ত্রী হওয়া যে কত বড় দুঃখ তুমি বুঝবে না।

বঙ্কিম ॥ আমি জানতাম না—আমি এটা জানতাম না। তুমি এত অসুখী লক্ষ্মী?

রাজলক্ষ্মী ॥ কিন্তু না, আর আমি অসুখী নই। এবার আমার গর্ব।

বঙ্কিম ॥ গর্ব।

রাজলক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ গর্ব। আজ আমি ছাড়া আর কে বলতে পারে, জানেন পাঠক-পাঠিকা, এই যে দুর্গেশনন্দিনী—যা পড়ে আপনারা ধন্য ধন্য করছেন —সে দুর্গেশনন্দিনী নাও যদি হই আমি, কিন্তু নবেলটা যিনি লিখেছেন তিনি আমারি ইয়ে— [বঙ্কিমের বুকে পড়িলেন।]

বঙ্কিম ॥ (হাসিয়া আদর করিতে করিতে) দুর্গেশনন্দিনী লেখা আজ আমার সার্থক। কই পূর্ণ, চা কই? ওরে রামু, তামাক দে।